বাংলাদেশের উপর জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের দ্বিতীয় সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি (UPR)

সংশ্লিষ্ট সুপারিশ ও প্রতিবেদন

বাংলাদেশের উপর জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের দ্বিতীয় সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি (UPR) সংশ্লিষ্ট সুপারিশ ও প্রতিবেদন

প্রকাশনায়
কাপেং ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশের উপর জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের দ্বিতীয় সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি (UPR) সংশ্লিষ্ট সুপারিশ ও প্রতিবেদন

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব
কাপেং ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদের ছবি
বিনোতাময় ধামাই

মুদ্রণে
থাংস্রে কালার সিস্টেম

প্রকাশনায়
কাপেং ফাউন্ডেশন
বাড়ি # ২৩/২৫, সালমা গার্ডেন
রোড # ৪, পিসি কালচার হাউজিং
শেখেরটেক, ব্লক # খ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮-০২-৮১৯০৮০১
ইমেইল : kapaeeng.foundation@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.kapaeeng.org

ভূমিকা

সার্বজনীন (মানবাধিকার) পরীবিক্ষণ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের একটি নতুন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি প্রতি চার বছর অন্তর পর্যালোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র অন্য সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তাঁর দেশের নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষায় কতটা সজাগ ও সক্রিয় এবং নাগরিকদের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী পদক্ষেপ সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তার বর্ণনা দেন। সেই সাথে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে সুপারিশ পেশ করে। উত্থাপিত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে রাষ্ট্র ঠিক করে তারা সেসব সুপারিশ গ্রহণ করবে কিনা। এভাবে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসে। পরবর্তীতে চার বছর পর আবার এইসব প্রতিশ্রুত বিষয়াবলী নিয়ে রাষ্ট্রকে জবাবদিহি করতে হয় অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মুখে। বিগত সময়ে ২০০৯ সালে প্রথম পর্ব এবং ২০১৩ সালে দ্বিতীয় পর্বে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের এই ব্যবস্থার অধীনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়। এই মানবাধিকার পরীবিক্ষণ ব্যবস্থায় দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে আদিবাসী প্রতিনিধিরাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং ছায়া প্রতিবেদন পেশ করে। সরকার এবং ইউপিআর বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। অন্যান্য অনেক বিষয়াবলীর মধ্যে আদিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয় এবং সরকার এই বিষয়ক বেশ কিছু সুপারিশ গ্রহণ করে। মানবাধিকার পরিষদের এই ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষকে জানানো এবং আদিবাসীদের অধিকার সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত সুপারিশসমূহ প্রচারের জন্য কাপেং ফাউন্ডেশন সার্বজনীন পরীবিক্ষণ পদ্ধতিতে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের উপর জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের দ্বিতীয় সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সুপারিশ ও প্রতিবেদনসমূহ অনুবাদে এবং সম্পাদনা সহযোগিতায় ভূমিকা রাখার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই কাপেং ফাউন্ডেশনের ডকুমেন্টেশন সহযোগী টিসেল চাকমা এবং শিক্ষানবিশ কৌশিক চাকমা, শিফেন ত্রিপুরা, মোনজুনি চাকমা, প্রিয়তা ত্রিপুরা, প্রিয়াঙ্কা তনচংগ্যা, কচি চাকমাসহ কাপেং ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের।

আশা করি এই উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণ আরও ব্যাপকভাবে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে প্রতিশ্রুত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে উদ্বুদ্ধ উৎসাহিত করবে।

রবীন্দ্রনাথ সরেন
চেয়ারপারসন
কাপেং ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

১.	আদিবাসীদের অধিকার ও মানবিক মর্যাদার অবস্থা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	০৫
২.	২৯ এপ্রিল ২০১৩ সালে জেনেভায় মানবাধিকার পরিষদের ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউর দ্বিতীয় চক্রে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্বোধনী বক্তব্য	০৮
৩.	ইউপিআর দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পেশকৃত রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন	১৫
৪.	দ্বিতীয় সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতিতে (ইউপিআর) বাংলাদেশের 'কোয়ালিশন অফ ইন্ডিজেনাস পিপলস্ অর্গানাইজেশনস' এর প্রতিবেদন	৩৭
৫.	সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি (ইউপিআর) সম্পর্কিত ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সমর্থিত আদিবাসী বিষয়ক সুপারিশসমূহ	৪৭
৬.	ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ ওয়ার্কিংগ্রুপ ১৬তম অধিবেশন বাংলাদেশের ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ অস্ট্রেলিয়ার বিবৃতি	৬৩
৭.	ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ ওয়ার্কিংগ্রুপ ১৬তম অধিবেশনে ইন্টারেক্টিভ ডায়ালগ সেশনে বাংলাদেশ সম্পর্কে ডেনমার্কের বিবৃতি	৬৪

আদিবাসীদের অধিকার ও মানবিক মর্যাদার অবস্থা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

১. ভূমিকা:

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল (ইউএনএইচআরসি) যখন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তখন বাংলাদেশের আদিবাসীরা তাদের অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের আশার আলো দেখে। বিগত ২০০৯ ও ২০১৩ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল 'ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর)'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় চক্রে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার পরে বাংলাদেশের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন আদিবাসীদের অধিকার ও উদ্বেগসমূহ পরিপূরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকার এসব সুপারিশসমূহ গ্রহণ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সম্মতি প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকার ইউপিআর-এর সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের আদিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত হবে।

ইউনিভার্সাল পিরিঅডিক রিভিউ (ইউপিআর) কি এবং কেন?

১৫ মার্চ ২০০৬-এর এক সাধারন অধিবেশনে জাতিসংঘ 'ইউনিভার্সাল পিরিঅডিক রিভিউ (ইউপিআর)' পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা পরবর্তীতে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল (ইউএনএইচআরসি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক ইউপিআর অধিবেশন সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় প্রতি চার বছর পরপর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল 'ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ'-র মাধ্যমে যথাযথভাবে মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মানবাধিকার রক্ষা ও বাস্তবায়ন করার জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে তাগিদ দেয়।

২. ইউনিভার্সাল পিরিঅডিক রিভিউ (ইউপিআর) ও বাংলাদেশের আদিবাসী:

ইউপিআর কার্যপদ্ধতিতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশেষ করে আদিবাসী, দলিত ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের অবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতিসমূহ পর্যালোচিত হয়। বিগত ইউপিআর-এর প্রথম ও দ্বিতীয় চক্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদনের পাশাপাশি বাংলাদেশের সুশীল সমাজের জোট, আদিবাসী সংগঠন, এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, সংকট ও কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতাসমূহের কথা তুলে ধরে বিকল্প প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

বিগত ইউপিআর-এর প্রথম চক্রে (২০০৯) বাংলাদেশের আদিবাসীদের অংশগ্রহণ কম ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় চক্রে (২০১৩) বাংলাদেশের আদিবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল এবং ২৬টি বিকল্প প্রতিবেদনের পাশাপাশি 'কোয়ালিশন অব ইন্ডিজিনাস পিপলস্ অর্গানাইজেশন'-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের মানবাধিকারের অবস্থা ও উদ্বেগ সম্পর্কে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের কাছে একটি বিকল্প প্রতিবেদন পেশ করে। ফলে, ইউপিআর-এর প্রথম চক্রের চেয়ে দ্বিতীয় চক্রে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের অস্তিত্ব ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনার পরে নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়, যেগুলো বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে ও বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেবে বলে রাষ্ট্রীয় সম্মতি প্রদান করে।

৩. ইউপিআর প্রথম চক্র (২-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯):

ইউপিআর প্রথম চক্রে বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়, যেগুলোর মধ্য থেকে শুধু 'আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষর অথবা সম্মতি জ্ঞাপন, এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন' সম্পর্কিত দুইটি সুপারিশ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে। কিন্তু প্রথম চক্রের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও এই দুইটি সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার কোন প্রকার উদ্যোগ বা যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি। যার ফলে, ইউপিআর দ্বিতীয় চক্রের (২০১৩) পূর্বে ও আজ পর্যন্ত এই দুইটি সুপারিশ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

৪. ইউপিআর দ্বিতীয় চক্র (২২ এপ্রিল - ৩ মে ২০১৩):

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের দ্বিতীয় চক্রের অধিবেশনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও সরকারের গৃহীত প্রথম চক্রের সুপারিশসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এবং এই পর্যালোচনার ফলাফলে দেখা যায় আদিবাসীদের মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ইউপিআর প্রথম চক্রের সুপারিশসমূহের কোনটিই বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। ইউপিআর দ্বিতীয় চক্রের অধিবেশনে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দেয়া সুপারিশের মধ্য থেকে ১৬৪টি সুপারিশ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে, যার মধ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার সম্পর্কিত;

ক. আদিবাসী এবং ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কিত ১৯৮৯ সালের 'আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯' অনুস্বাক্ষর করা (মেক্সিকোর সুপারিশ, নং ১৩০.৫);

খ. আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সংরক্ষণ এবং তাদের নিজেদের উন্নয়নের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত 'আইএলও কনভেনশন ১৬৯' স্বাক্ষর করা (ডেনমার্কের সুপারিশ, নং ১৩০.৬);

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া (অষ্ট্রেলিয়া এবং ইকুয়েডরের সুপারিশ, নং ১২৯.১৫৩);

ঘ. আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপর সকল ধরনের সহিংসতা ও বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে সঠিক এবং কার্যকর কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা (স্লোভাকিয়ার সুপারিশ, নং ১৩০.২৪);

এছাড়াও বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার, আইনগত সুরক্ষার নিশ্চয়তা সমুন্নত রেখে তাদের মর্যাদা সংরক্ষণ এবং সহিংস আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে ৩ একশনএইড বাংলাদেশ সকল ধরনের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্যের ঘটনার সুরাহা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সুপারিশ প্রদান করে।

৫. ইউপিআর দ্বিতীয় চক্রের সুপারিশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ ও বাস্তব পরিস্থিতি:

২০১৪ সালের বাংলাদেশের দশম সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট আবারও সরকার গঠন করেছে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের দশম নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, অনুন্নত সম্প্রদায় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারের এই প্রতিশ্রুতিগুলো নিঃসন্দেহে ইউপিআর দ্বিতীয় চক্রের সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু ইউপিআর দ্বিতীয় চক্রের পর এক বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট ইউপিআর দ্বিতীয় চক্রের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের তেমন কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

পক্ষান্তরে, আদিবাসীদের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতা না কমে তা আরও মারাত্মকভাবে অব্যাহত রয়েছে। ২০১৪ সালের জানুয়ারি-এপ্রিল পর্যন্ত এই চার মাসেই ১৯ জন আদিবাসী নারী ও শিশু সহিংসতা ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে দু'জনকে গণধর্ষণের পর হত্যা ও দু'জনকে অপহরণ করা হয়েছে। তাছড়াও ২০১৪

সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, সম্পত্তি লুটপাট, মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, খুন ও নির্যাতন, নারীদের ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানিসহ নানা ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে।

ইউপিআর দ্বিতীয় চক্রের অধিবেশনের পরে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। সর্বোপরি, বাংলাদেশের সামগ্রিক মানবাধিকার উন্নয়ন ও ইউপিআর দ্বিতীয় চক্রে গৃহীত সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজন আরো সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়া।

৬. কিছু করণীয়:

'ইউপিআর কি এবং কেন?'-এই বিষয়টি বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে এখনো পৌঁছায়নি। প্রত্যেক ইউপিআর চক্রে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যে সমস্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করে সেসমস্ত সুপারিশসমূহ দেশের জনগণের কাছে জানানোর কথা থাকলেও সরকার তা করে না। এখনো পর্যন্ত এটি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে সীমাবদ্ধ রয়েছে। আর এ বিষয়টি সর্ম্পকে শুধুমাত্র হাতেগোনা কিছু এনজিও ও মানবাধিকারকর্মী, এবং কিছু গণমাধ্যম ও সচেতন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অবগত আছেন। বাংলাদেশের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই এই ইউপিআর সম্পর্কে জানে না। যার ফলে ইউপিআর -এর অধিকাংশ সুপারিশ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতিসমূহ অবাস্তবায়িত থেকে যায়। তাই এ অবস্থা উত্তরণের জন্য যা করা প্রয়োজন, সেগুলো সুপারিশ আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হল;

ক. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক জোট গঠন করে আদিবাসীদের মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট ইউপিআর সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবি জানানো।

খ. ইউপিআর সুপারিশসমূহ জনগণের কাছে নিয়ে গিয়ে জনসচেতনতা তৈরির মাধ্যমে ইউপিআর সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে গণদাবি উঠানো।

গ. 'ইউপিআর সুপারিশ, আদিবাসী ও বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব' এই বিষয়ে গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দল ও সরকারি নীতি নির্ধারকদের সংবেদনশীল করা। এবং গণমাধ্যমসমূহে ইউপিআর সুপারিশ অগ্রগতির বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রচার করা।

ঘ. পরবর্তী ইউপিআর-এর সময় রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদনের পাশাপাশি বিকল্প প্রতিবেদন তৈরি ও পেশ করার সময় আদিবাসীদের কার্যকরী অংশগ্রহণ বাড়ানো।

৭. উপসংহার:

পরিশেষে, বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার, এবং বহুজাতি ও বহু-সাংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিয়ে যে গর্ববোধ করে, সেটি তখনিই পরিপূর্ণতা পাবে যেদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো ও সরকার দেশের সকল নাগরিকের মর্যাদা, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়নের রূপ দিতে পারবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ইউপিআর সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন বাংলাদেশের গৌরবের পরিপূর্ণতা দানে কার্যকরীভাবে সহায়তা করতে পারে। এজন্য, শুধু সুপারিশ গ্রহণ ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া বা প্রতিশ্রুতি দেয়া নয়, দেশের আপামর জনগণের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকে আরো এগিয়ে আসতে হবে। ইউপিআর তৃতীয় চক্র অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগণের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। ইউপিআর সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি রাষ্ট্রের সকল জনসাধারণকেও এগিয়ে আসতে হবে। তারপরেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ তথা বিশ্ব পর্যায়ে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

২৯ এপ্রিল ২০১৩ সালে জেনেভায় মানবাধিকার পরিষদের ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউর দ্বিতীয় চক্রে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্বোধনী বক্তব্য

মিঃ প্রেসিডেন্ট
মহামান্য ব্যক্তিবর্গ
সুধীবৃন্দ
আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা এখানে এসেছি কারন রাজধানীর অদূরে দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটি নয়তলা ভবন ধসে ৩৭৭ জনকে আমরা হারিয়েছি। আমরা তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভে প্রার্থনা করি। আমাদের পেশাদার উদ্ধারকারীরা ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপ থেকে ২৪৩১ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে। আমি আজ এই শোকের দিনে জাতি হিসেবে আরো শক্তিশালী হয়ে আত্মপ্রকাশ করার প্রত্যয় নিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট

২০০৯ সালে ইউপিআরে আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করেছিলাম যে, 'আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থায় বিশ্বাসী। তাই আমরা ভবিষ্যতে ফলাফল নির্ভর কাজে মনোযোগ দেব। পরিবর্তন আসবেই!' আজ আমি বলতে চাই, বাংলাদেশে আসলেই পরিবর্তন এসেছে। জাতি হিসেবে আমরা অন্তর্ভুক্তিকরণ, বহুত্ববাদ ও মুক্তির পথে অবিচল ছিলাম।

সেদিন আমি আরো বলেছিলাম যে, 'আমরা বিশ্বাস করি জনগণের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারা পর্যন্ত কোন সরকারই সত্যিকারের জনগণের সরকার হতে পারেনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে এরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল যথেষ্ট সাহসিকতা ব্যাপার। তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করে জনগণের পূর্ণ মানবাধিকার নিশ্চিত করার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

কিন্তু এখনও আমাদের অনেকদূর যেতে হবে, কারণ চরম দারিদ্রতার মাঝে সামনে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের অনেক অর্জনই কিছু কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা যেমন— জলবায়ু পরিবর্তন, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও দ্রুত শহরায়নের ফলে মলিন হয়ে যাচ্ছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে পদক্ষেপ নেওয়ার পরও আমরা আমাদের সব নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারিনি। তবে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চার বছর আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর।

সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিচ্ছি যাতে এগুলো আমাদের জনগণের অধিকার রক্ষায় কাজ করে। গত ইউপিআরের পর থেকে বলিষ্ঠ আদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরিতে আমাদের অনেক অগ্রতি হয়েছে যার ফলে দেশের সবাই মানবাধিকার ভোগ করতে পারবে।

মিঃ প্রেসিডেন্ট

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশের নাগরিকদের পাকিস্তান আমলে খর্ব হওয়া মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া শুরু হয়। বাংলাদেশ সংবিধান নাগরিকের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার পুনর্বহাল করে। ২০০৯ সালের পর থেকে বড় ধরণের আইনি ও আদর্শগত সংস্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম হল সুপ্রিমকোর্টের আদেশবলে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতিগুলো পুনর্বহাল করা। এ মূলনীতিগুলোই একটি বহুজাতিক, গণতান্ত্রিক, ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম ভিত্তি।

১৫তম সংশোধনী শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের ভিত্তি করে দেয়। সারাবিশ্বের প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশেও একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের অধীনে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে পদক্ষেপ নেয়ার এটাই সময়।

গত চার বছর ধরে সরকার জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্বশাসন প্রদানসহ বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। পুনর্গঠিত কমিশন সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ৫৫০০ অধিক অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করেছে যেখানে ৬৫,০০০ জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। এ বছরের শেষদিকে কমিশন আমাদের একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দেবে সেদিকেও আমরা তাকিয়ে আছি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট

গত চার বছর নবম সংসদ ১৯৬টি আইন পাশ করেছে যার অধিকাংশতেই মানবাধিকার সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সংসদ উদ্বোধনী অধিবেশনেই ৫০টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করে এবং প্রথমবারের মত বাংলাদেশে বিরোধী দল থেকে চেয়ারপারসন নিয়োগ দেয়। সরকার ও বিরোধীদল মিলে গঠিত এ কমিটিগুলো নির্বাহী বিভাগের নজরদারি করে থাকে।

২০০৯ সালে আমি অঙ্গীকার করেছিলাম যে আমাদের সরকার বিচার বিভাগকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই করতে প্রস্তুত। আমরা ২০০৯ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি আইন সংশোধনীতে নিম্নবিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার নিশ্চয়তা দিয়েছি। সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতির সাথে আলোচনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে বিচার ব্যবস্থাকে আরো অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

আমি গতবার একটি মানবাধিকার কমিশনের কথা বলেছিলাম যেটি এখন বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করার একমাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একজন বিশিষ্ট চেয়ারপারসন ও দক্ষ জনবল সম্বলিত একটি টিমের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যাদের নিজেদেরই উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করার সামর্থ রয়েছে।

দুর্নীতিদমন কমিশনও আগে এত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। তদন্ত ও বিচার কাজে তাদের মধ্যে এত তৎপরতাও এর আগে তেমন চোখে পড়েনি। কমিশন বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে সমনজারি ও জিজ্ঞাসাবাদ করে জনগণের আস্থা অর্জন করেছে।

গত বছর আমাদের সরকারই প্রথম জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে সমাজের সকল স্তর থেকে দুর্নীতি নির্মূল করতে সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশনের পর্যবেক্ষণের আওতায় আসে।

এছাড়া ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করা ও একটি স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠন করা আমাদের সময়ের সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০১১-১২ সালে কমিশন সরকারি অফিসসমূহের সকল তথ্য বিষয়ক আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করে।

মিঃ প্রেসিডেন্ট

২০০৯ সালের অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে জনগণের বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। আজ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা ফিরে এসেছে। সম্প্রতি দেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় আহত পুলিশ সদস্যদের উদ্ধারে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই তা প্রমান করে।

তবে পৃথিবীর সব দেশের মত আমাদের দেশেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আমাদের সরকার দ্ব্যর্থহীনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ন্যূনতম ছাড় না দেওয়ার অবস্থান নিয়েছে ঠিক যেভাবে তাদের দায়মুক্তির বিরুদ্ধে আমরা অবস্থান নিয়েছি। যেমন, আজ পর্যন্ত ১৬৭৮ জন র‍্যাব সদস্যের বিরুদ্ধে আইনি ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আমরা স্বীকার করি যে অপরাধীদের সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের গুলি বিনিময়ের সময় মৃত্যুর মত ঘটনা ঘটে। তবে গুলি বিনিময়ের সময় মৃত্যু বা বল প্রয়োগের মত ঘটনা ঘটে থাকলে তা প্রচলিত আইনেই তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে আমরা অবস্থান নিয়েছি।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো গুম ও অপহরণের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আমাদের জন্য একটি অন্যতম সমস্যা। দণ্ডবিধি অনুযায়ী পুলিশ এসব অপহরণ ও গুমের ঘটনাগুলো নিবন্ধন করেন। যদিও ২০১২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাকি বিশ্বের তুলনায় এ সংখ্যাটা খুবই নগণ্য। যে ব্যাপারটি নিয়ে আমরা এ মুহূর্তে খুবই উদ্বিগ্ন তা হল ক্রমবর্ধমান হারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাম ব্যবহার করে নকল পরিচয় দিয়ে অপহরণ। আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক অবস্থান নিয়েছি এবং ইতিমধ্যে গুমের সাথে জড়িত ৫৪০ জন ভূয়া পরিচয় দানকারীকে আটক করা হয়েছে। কেবল র‍্যাবই ৮০০ জনের অধিক অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে এবং ১৪৩১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

মিঃ প্রেসিডেন্ট

গত ইউপিআরে আমি অঙ্গীকার করছিলাম যে আমাদের সরকার দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে নিজের অবস্থানে অবিচল থাকবে। আমরা জানতাম সময়ের সাথে সাথে আমাদের অনেক চড়াই উতরাই পার হতে হবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তার পরিবারের ১৮ জনের হত্যার বিচার আমরা শেষ করেছি। এর ফলে জাতি ৩৪ বছর ধরে বয়ে বেড়ানো এক লজ্জা থেকে মুক্তি পেল। এ বিচারের মাধ্যমে জাতির পিতার আত্মস্বীকৃত খুনীরা নৃশংস অপরাধ করা সত্ত্বেও দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বলে শাস্তি থেকে যে অব্যাহতি পেয়ে আসছিল তার অবসান হয়।

আমরা এখন ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে সংঘঠিত জাতীয় চার নেতার হত্যার বিচারের রায়ের অপেক্ষায় রয়েছি যেটি আগামীকাল ঘোষণা করা হবে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম একটি অঙ্গীকার হল ১৯৭১ সালে সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার বিচার শুরু করা। এ ব্যাপারে আমরা যুব সমাজের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছি যাদের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি।

এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে সরকার ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের আদলে দেশেও একটি অভ্যন্তরীণ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে অভিযুক্তদের বিচারের ব্যবস্থা করে। প্রতিশ্রুতির প্রতি অবিচল থেকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে আমরা যথাসম্ভব স্বচ্ছবিচার নিশ্চিত করতে চেষ্টা করছি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট

ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুদৃঢ় করাকে আমাদের সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যাতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষ নাগরিক হিসেবে সমানাধিকার ভোগ করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের কষ্টার্জিত সাফল্যকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার জন্য একটি বিশেষ মহল ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর হামলা করে বার বার বাঁধা হয়ে দাড়াচ্ছে। আমি আবারো ঘোষণা করছি, সংখ্যালঘুদের হত্যা ও হুমকিকে সরকার কখনও প্রশ্রয় দেবে না। কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধদের

উপর কাপুরুষোচিত হামলা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের উপর হামলা কেবল আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে আরো দ্বিগুণ সুদৃঢ় করেছে।

এ ঐক্যের বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমরা আমাদের প্রতিনিধি দলে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং চাকমা সম্প্রদায়ের তিনজন বিশিষ্টজনকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমি প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিতে চাই শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথেরকে যিনি সীমা বিহারের অধ্যক্ষ হিসেবে অগ্নিসংযোগ ঘটনার একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং সরকারি সহায়তায় তার তত্ত্বাবধানেই এ বিহারের পুনঃনির্মাণ করা হয়। এছাড়া আমাদের সাথে আরো রয়েছেন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের মহাসচিব এ্যাডভোকেট রানা দাসগুপ্ত এবং বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টের মিঃ জ্ঞানেন্দ্র চাকমা।

মিঃ প্রেসিডেন্ট

১৫তম সংবিধান সংশোধনী প্রথমবারের মত দেশের ৪৮টি উপজাতীয় সম্প্রদায়কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে চাই যাতে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ২০১০ সালের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন এক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের অগ্রতি।

বিগত মেয়াদে আমাদের সরকার ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ধারাগুলো বাস্তবায়নে যথেষ্ট আন্তরিক ছিল। এ মেয়াদেও আমরা চুক্তির জটিল বিষয়গুলো অনুধাবনপূর্বক অনেক দূর এগিয়েছি যার মধ্যে অন্যতম হল প্রতিশ্রুত ৩৩ বিভাগের দুই তৃতীয়াংশই জেলা পরিষদ গুলোর কাছে হস্তান্তর। এছাড়া, ২০০১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইনের সংশোধনীও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে গৃহীত এ সংশোধনী খুব শীঘ্রই মন্ত্রী পরিষদে তোলা হবে।

মিঃ প্রেসিডেন্ট

নারীর ক্ষমতায়নে সাহসী নীতিমালা গ্রহণ করে বাংলাদেশ আজ একটি প্রগতিশীল জাতি হিসেবে নিজের পরিচয় করে নিয়েছে। রাজনীতির ময়দানে নারীদের দৃশ্যমান উপস্থিতি নীতিমালা প্রণয়নে তাদের মতামতকে প্রতিনিয়ত আরো জোরালো করছে। আড়াই কোটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কয়েকলক্ষ গার্মেন্টিসকর্মীসহ আমাদের নারীরা এখন দেশের একটি বড় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরা ছেলেদেরকে পেছনে ফেলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফলাফলের দিক থেকেও ছেলেদের চাইতে এগিয়ে থেকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য-৩ অর্জনে ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়া, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের বর্ধিত সচেতনতা লক্ষ্য-৪ ও ৫ অর্জনের পথে আমাদের অনেকদূর নিয়ে গেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে এখনও নারী নির্যাতন অব্যাহত আছে। আমাদের সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নসহ পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী পাচার ও পর্ণোগ্রাফী প্রতিরোধে বেশ কিছু আইনের মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে ক্ষমতায়নের ফলে নারীরা শেষ পর্যন্ত সকল বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

শিশুদের স্কুলে ভর্তির হার প্রায় বিশ্ব পর্যায়ে নিয়ে আসা, বিশ্ব টিকা কর্মসূচিতে সাফল্য অর্জন, ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনার ফলে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ অর্জনগুলোকে আরও বিস্তৃত করতে আমরা শিশুদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদেরকে স্কুলে ভর্তির হার ধরে রাখা এবং অপুষ্টি দূর করার উপর জোর দিচ্ছি।

এ লক্ষ্যে আমরা একটি শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা, একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করে শিশুশ্রম বন্ধের ব্যবস্থা নিয়েছি। এছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিশুনীতিকে সামনে রেখে আমাদের শিশুদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

মিঃ প্রেসিডেন্ট

শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের কথা চিন্তা করে, নির্বাচনী অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আমরা জাতীয় শ্রমনীতিকে সংশোধন করেছি এবং ২০০৬ সালের জাতীয় শ্রম আইনেও বেশকিছু পরিবর্তন এনেছি। এ

সংশোধনীগুলো ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করবে এবং তাদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ২০১০ সালে বাংলাদেশ 'মাইগ্রেন্ট রাইটস কনভেনশন' এ অনুসাক্ষর করে। অভিবাসীকর্মীদের অধিকারকে মানবাধিকার বিবেচনায় আমরা 'প্রবাসী কল্যাণ আইন' প্রণয়ন করেছি যাতে তাদের অধিকার সমুন্নত থাকে।

মি: প্রেসিডেন্ট

সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আইনি অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিবন্ধীদের অধিকারের কথা বিবেচনায় রেখে আমাদের সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১২' এর খসড়া সংসদে উত্থাপন করেছে যা খুব শীঘ্রই গৃহীত হবে। অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত শিশুদের সুরক্ষায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে গত বছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজ্যুলেশনে এ বিষয়টি গৃহীত হয়।

দলিত এবং সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কথা চিন্তা করে আমাদের সরকার বিশেষ দৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা নিয়েছে।

আমাদের সামর্থের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে এবং স্থায়ী সমাধান হিসেবে তাদের মায়ানমার প্রত্যাবাসনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, জনসংখ্যার ঘনত্ব, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় আমরা আর কোন রোহিঙ্গাকে শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করতে অক্ষম।

মি: প্রেসিডেন্ট

সাধারণত দারিদ্র্যতাই আমাদের প্রধান উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা যার কারণে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ মানবাধিকার বঞ্চিত। অথচ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা অর্জন সত্ত্বেও, দারিদ্রতাই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ হিসেবে রয়ে গেছে। এজন্য আমরা বিশ্বাস করি যে উন্নয়নই মানবাধিকার অর্জনের পূর্বশর্ত। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এর প্রতিফলন রয়েছে।

মাথাপিছু গণনায় ২০১০ সালে বাংলাদেশের ৩১.৫% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক ১.৮% হারে দারিদ্র্য কমে এসেছে। এ হারে কমতে থাকলে ২০১৫ সাল নাগাদ দেশের দারিদ্র্যতার হার ২২.৫% এ নেমে আসবে।

খাদ্য নিরাপত্তা প্রশ্নে বলতে গেলে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আমাদের খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে চাল উৎপাদনে প্রায় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করেছি। খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য আসায় ২০১০ সাল নাগাদ দেশের মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৩১৮ ক্যালরিতে। গত দুই দশকে ক্ষুধার হার কমানোতে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে রয়েছে।

দেশের সব নাগরিকের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাদের সরকার ১৩,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করেছে। ১৯৯০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রতিহাজারে শিশুমৃত্যুর হার ১৪৬ থেকে কমিয়ে ৫০ এ নামিয়ে এনেছি যা বাংলাদেশকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন পুরষ্কার ২০১০ এনে দিয়েছে। গত নয় বছরে মাতৃমৃত্যুর হারও ৪০% কমে এসেছে প্রতি এক লক্ষ শিশু জন্ম হার ৩২২ থেকে নেমে ১৯৪-তে নেমে এসেছে।

আমাদের সরকার শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে। ৬ থেকে ১০ বছরের সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয় পড়ুয়া সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয় পড়ুয়া ৭৮ লক্ষ শিক্ষার্থী বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের জন্য বৃত্তি দেয়া হচ্ছে।এছাড়া, ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে দেশের শিক্ষাব্যাবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনার ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা সারাদেশে ৩,০৪৭টি আইসিটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট,

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত একটি দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর তার মোট জিডিপির ১.৫% করে হারাচ্ছে। বিদ্যমান তথ্যানুসারে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৫-২০% পানির নিচে চলে যাবে। যদি তাই হয় তাহলে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে প্রায় ৩ কোটি মানুষ বাস্তচ্যুত হয়ে পড়বে এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির সংকট দেখা দেবে। ২০১২ সালে বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি 'জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার' শীর্ষক রেজ্যুলেশন গ্রহণ করার জন্য মানবাধিকার পরিষদকে আহ্বান করে।

মিঃ প্রেসিডেন্ট,

বাংলাদেশ তার সুশীল সমাজ ও নাগরিক সংগঠনগুলোর জন্য গর্ববোধ করে কারণ তারা জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো তুলে ধরতে সরকারকে সহায়তা করে থাকে। সরকার বিশ্বাস করে এনজিওগুলোকে তাদের নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রগুলোতে অবস্থান করে দেয়া দরকার যাতে সমাজের যে জায়গায় সরকারি সেবা পৌঁছায় না সেখানে তারা অবদান রাখতে পারে। আমরা শাসন পদ্ধতি ও উন্নয়ন সম্পর্কিত যেকোন জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সাথে পরামর্শ করার সংস্কৃতি চর্চা করে থাকি। এক্ষেত্রে ইউপিআর প্রস্তুতিতে তাদের সাথে আমাদের বোঝাপড়ার বিষয়টি একটি অন্যতম উদাহরণ।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা চর্চা অব্যাহত রাখতে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বিতর্কে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সরকার ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করে। আমরা এ মেয়াদেই ২৯টি বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেল অনুমোদন দিয়েছি যা একথায় অভূতপূর্ব। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আমরা কিছু আইনি বিধানে পরিবর্তন এনেছি যেগুলো পূর্বে সাংবাদিকতায় বাধা সৃষ্টি করত। গণমাধ্যমকর্মীদের উপর যেকোন ধরনের হামলা, সহিংসতা ও নির্যাতনের সাথে সাথে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে সরকার বদ্ধপরিকর। এছাড়া আমরা জাতীয়ভাবে মানবাধিকার শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। প্রথম ইউপিআরের অঙ্গীকার হিসেবে আমরা হিউম্যান রাইটস স্পেশাল রিপোটিয়ারের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছি এবং এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

মিঃ প্রেসিডেন্ট

বিশিষ্টপ্রতিনিধিবৃন্দ,

আমার উদ্বোধনী বক্তব্যে অনেক বিষয়ই তুলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। আমাদের জাতীয় প্রতিবেদনে আমরা গত ইউপিআরের ৪২টি সুপারিশের প্রায় সবগুলোই তুলে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছি। আমার উপস্থাপনার সময় আমি চেক প্রজাতন্ত্র, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, লিচেনস্টেইন, মেক্সিকো, মন্টিনিগ্রো, নেদারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের করা প্রশ্নের উত্তর দেয়ারও চেষ্টা করেছি। আমি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অপর প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি পরবর্তীতে দেয়ার চেষ্টা করব।

মূলত আমি জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং ভবিষ্যতে এ প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। একই সাথে আমাদের চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধতাগুলোর কথাও আমি বলেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে গত চার বছরে সরকার একটি ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হয়েছে যা আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। এই ক্রান্তিকালে সামনের জাতীয় নির্বাচনই নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ আগামীতে কোনদিকে যাবে। ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় জাতি হিসেবে আমাদের কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বন্ধুদের সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদ।

সমাপনী বক্তব্য:

আমরা মানবাধিকার পরিষদের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে আগ্রহী। আমরা বিশ্বাস করি ইউপিআর মানবাধিকার পরিষদের কার্যকর পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম যা তৃণমূল পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। আমি আনন্দের সাথে বলতে চাই যে, এ কার্যপদ্ধতির চর্চাকে আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের সাথে কাজ করার প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যাবহার করছি। এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশিষ্টতার জন্য আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সুশীল সমাজ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে সাধুবাদ জানাই। প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করা জন্য আমি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কমিশনের সদস্যদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে চাই। সব বিষয়ে মতৈক্য না থাকা সত্ত্বেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ায় এবং আলোচনা চালিয়ে যাওয়ায় আমি তাদের প্রশংসা করি।

পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য আমি সব রাষ্ট্রকে ধন্যবাদ দিতে চাই। সহযোগিতা এবং নির্দেশনার জন্য Troika সকল সদস্য রাষ্ট্রের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। নিখুঁত সময় ব্যাবস্থাপনার জন্য আমি সভাপতিকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই। এছাড়া আমি সেক্রেটারিয়েট এবং দোভাষীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই যাদের ছাড়া এ সংলাপ সম্ভব হত না।

ইউপিআর দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পেশকৃত রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন

ক. প্রারম্ভ

গণতন্ত্র, উন্নয়ন, মানবাধিকার, অসাম্প্রদায়িকতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লাখ শহীদের রক্ত আর দু'লাখ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশ নামক দেশটির জন্ম হয়েছিল। বাংলাদেশের রয়েছে গর্ব করার মতো উদীয়মান বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এবং সংস্কৃতি মিলে গঠিত হয়েছে একটি অসাম্প্রায়িক সমাজ।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে মহাজোট সরকার এ পর্যন্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বোচ্চসংখ্যক আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিমালাগত সংস্কার সাধন করেছে। দেশে মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে এরই মধ্যে যেসব মাইলফলক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষা, বিশেষ করে নাগরিক স্বাধীনতা থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নতুন উন্নয়ন প্যারাডাইম সৃষ্টি। সরকারের 'ভিশন ২০২১' কর্মসূচির আওতায় জনমুখী, দরিদ্রমুখী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এজেন্ডা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংসদে ১৯৬টি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যা অভাবনীয়। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়ন ঘটানো, যার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নের আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। এর মূল নিহিত মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' মডেলে যা গত বছর জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সম্পদ ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি সত্ত্বেও অন্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর তুলনায় জেন্ডার ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সহস্রাব্দ উন্নয়নে কয়েকটি লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি মানব উন্নয়ন সূচকে অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। বৈশ্বিক মন্দার সময়ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনুকূল রয়েছে। আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধির ফলে এর প্রতিবেদনে গত ইউপিআর ২০০৯ প্রতিবেদনের পর থেকে এ পর্যন্ত অর্জনগুলো উল্লেখ করার সাথে সাথে জনগণের বৃহত্তর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহযোগিতায় কী ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন তা উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি

সরকার এ প্রতিবেদন প্রণয়নের শুরু থেকেই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল, যেমন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার ও উন্নয়ন বিষয়ে বিশেজ্ঞদের (সংযুক্তি-১) সমন্বয়ে কয়েকটি বৃহৎ পরিসরের আলোচনা সভার আয়োজন করে। তেমনিভাবে সরকার নিজেও অন্য মানবাধিকার সংস্থাগুলোর আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যারা এই ধরনের আলোচনা সভায় গিয়েছিল তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে এই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ, মতামত এবং পর্যবেক্ষণগুলো বিবেচনায়

নেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির পাশাপাশি ২০০৯ সালের ইউপিআর (বিভিন্ন অংশে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য, উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ) ২০০৯ সালের পর মানবাধিকার সুরক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য গৃহীত আইনি, নীতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারগুলো

২০০৯ সালের পর মানবাধিকার সুরক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য গৃহীত আইনি, নীতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতি কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে অভূতপূর্ব সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। (সুপারিশ ৫, ইউপিআর ২০০৯)

মানবাধিকার সুরক্ষা কাঠামো সুদৃঢ়করণ

সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন ও এটি দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতাকে ন্যায্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের কোনো আইন সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারবে না। সংবিধান একদিকে যেমন দেশের সকল নাগরিকের জন্য বৈষম্যমুক্তি এবং আইনের দৃষ্টিতে সমান আশ্রয় লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে, অন্যদিকে তেমনি নারী, শিশু এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ওপরও জোর দিয়েছে। এছাড়াও সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে সরকার কর্তৃক জনসাধারণের গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করেছে। ২০০৯-১২ সালে সংসদ সংবিধানের ঐতিহাসিক পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধানের অন্তর্নিহিত মূলনীতিগুলো পুনর্স্থাপন করেছে এবং জাতীয় এজেন্ডায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নতুন বাস্তবতা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং জাতীয় আইন প্রণয়ন

আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৩৫০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৫০টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়, যার কয়েকটিতে সভাপতি পদে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বিরোধী দলের সদস্যদের নির্বাচিত করা হয়, যা বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ইউপিআর ২০০৯ এর পরথেকে নবম জাতীয় সংসদে ১৯৬টি আইন (সংযুক্তি-২) প্রণয়ন করা হয়েছে; যার অধিকাংশই সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নারী, শিশু, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, শ্রমিক, সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ইত্যাদির রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত। এ আইনগুলো প্রণীত হয়েছে আন্তর্জাতিক কিছু মানবাধিকার প্রতিশ্রুতি পালনের বাধ্যবাধকতাকে মাথায় রেখে (সুপারিশ-৪, ইউপিআর, ২০০৯)। উল্লেখযোগ্য নতুন আইনগুলো হলো–

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯;
- সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০০৯;
- পারিবারিক নির্যাতন (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০;
- জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০;
- জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল আইন, ২০১১;
- পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০;
- লিপার্স (বাতিল) আইন, ২০১১;

- বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, ২০১২;
- প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১১;
- ভবঘুরে ও গৃহহীন মানুষ (পুনর্বাসন) আইন, ২০১০;
- হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২;
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২;
- অপরাধ বিষয়ে যৌথ আইনগত সহায়তা আইন, ২০১২;
- পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২;
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা তহবিল আইন, ২০১২।

সুপ্রীমকোর্ট/উচ্চ আদালত

সুপ্রীম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আইনি কর্তৃপক্ষ। সুপ্রীম কোর্টের রায় দেশের সব নিম্ন আদালত, কর্মচারী এবং বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। সুপ্রীম কোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হলো মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা। সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি এমন অনেক বিষয়কে সুপ্রিম কোর্ট মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি/সনদের শর্তগুলোকে জাতীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

নীতিগত উদ্যোগ

২০০৯ সালের ইউপিআর-এর পর সরকার মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় বেশ কয়েকটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- জাতীয় শিশুশ্রম নির্মূল নীতি, ২০১০;
- জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০;
- জাতীয় শিশু অধিকার নীতি, ২০১০;
- গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১০;
- জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১১;
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১;
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১;
- জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১।

ঘ. মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

ইউপিআর ২০০৯-এর পর থেকে সরকার বাংলাদেশে মানবাধিকার বাস্তবায়নের বিষয়গুলো দেখভাল করার প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা এনএইচআরসির ওপর (সুপারিশ নং ৬ এবং ৭, ইউপিআর ২০০৯)। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়াতে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়েছে, পাশাপাশি এর ব্যাপক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়কারী কমিটি (আইসিসি) কর্তৃক 'বি' মর্যাদা লাভ করেছে। কমিশনের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যয় করার স্বাধীনতা এবং চেয়ারম্যান সদস্যদের পূর্ণ মেয়াদে থাকার নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠানটির স্বাধীন কার্যক্রমের জন্য সহায়ক হয়েছে। সরকার

কমিশনের আর্থিক বরাদ্দ এবং জনবল বাড়ানোর জন্য চিন্তাভাবনা করছে। ইতোমধ্যে কমিশন একটি অনলাইন অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা চালু করেছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যে কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনকে তদন্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি আইনে প্রদত্ত এখতিয়ার অনুযায়ী কমিশন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ অন্যান্য সরকারি কর্তপক্ষের কাছ থেকে ব্যাখা দাবি করতে, জেলখানা, কারাগার বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলে পরিদর্শন, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির তরফে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের এবং যে কোনো তদন্তের সময় ফৌজদারি অদালতের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন(দুদক)

দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক দুর্নীতি বিষয়ক অভিযোগ তদন্ত এবং মামলা পরিচালনাকারী একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সরকার দুদকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছে (সুপারিশ ২৪, ইউপিআর ২০০৯)। সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের তলব করে দুদক ইতোমধ্যেই জনগণের আস্থা অর্জন করেছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১২ জাতীয় সংসদের বিবেচনাধীন রয়েছে। দুদক ৯টি মহানগরী এলাকা, ৬২টি জেলা এবং ৪২১টি উপজেলায় জনসাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে (সুপারিশ ২৪, ইউপিআর ২০০৯)।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)

বাংলাদেশের সব ধরনের নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের (ইসি)। ২০১২ সালে একটি বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ দেন। ইসির স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন আইন, ২০০৯ এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে একে পৃথক করা হয়েছে। ইসিকে আর্থিক স্বায়ত্তশাসনও দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ আইন কমিশন

আইন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সংস্থা যা মৌলিক মানবাধিকার ও সমাজের মূল্যবোধের সাথে সংশ্লিষ্ট সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিলের সুপারিশ করে থাকে। এই কমিশন আইনের খসড়া তৈরি করে এবং আইনি কাঠামোর সংস্কার সাধনের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। খসড়া আইন চূড়ান্তকরণের আগে কমিশন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করে এবং তাদের সুপারিশ পর্যালোচনা করে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে কমিশন মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য আইন সংস্কারের ওপর অনেকগুলো প্রতিবেদন তৈরি করেছে; যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীর নিরাপত্তা, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও সাক্ষীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা এবং হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কার। আইন কমিশন বর্তমানে প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা, চিকিৎসায় অবহেলার বিরুদ্ধে নতুন আইন প্রণয়ন এবং পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু বিষয়ে আইন প্রণয়নের কাজ করছে।

তথ্য কমিশন

ব্যক্তিগত ও সরকার পর্যায়ে নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। তথ্য অধিকার আইন কেউ লঙ্ঘন করলে বা কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে

কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন বা সরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে ব্যর্থ হলে তথ্য কমিশন আইনি ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা রাখে।

জাতীয় আইন সহায়তা সংস্থা

আইন সহায়তা আইন, ২০১০ অনুযায়ী দরিদ্র জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার দেশের প্রথম আইন সহায়তা সংস্থা গঠন করে। সংস্থাটি কয়েকটা হটলাইন চালু করেছে, যেগুলো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারে। এটি জেলা আইন সহায়তা কমিটির মাধ্যমে সেবা দিয়ে থাকে, যা দেশের সবগুলো জেলাতেই চালু রয়েছে। প্রতিটি জেলা আইন সহায়তা কমিটির জন্য সরকারের আইনি সহায়তা তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

বেসরকারি এবং নাগরিক সমাজের সংগঠন

বাংলাদেশ তার অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত বেসরকারি (এনজিও) ও নাগরিক সংগঠনগুলো (সিএসও) নিয়ে গর্ব করে থাকে। এই সংগঠনগুলো মানবাধিকার, উন্নয়ন এবং সুশাসনের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারের কর্মতৎপরতার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে । বর্তমান সরকার ইউপিআর ২০০৯ এর ফলো আপ হিসেবে (সুপারিশ নং ৪২) এনজিও এবং সিএসও'র সঙ্গে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে, যা মানবাধিকার বিষয়ক আইন ও নীতিমালা তৈরিতে সক্রিয় অবদান রাখছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তথ্যমতে দেশে বর্তমানে ২ হাজার ১৭০টি এনজিও কাজ করছে। এনজিওগুলো নানামুখী কাজের সঙ্গে জড়িত, যেমন– ক্ষুদ্রঋণ, দারিদ্য বিমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ রক্ষা, শিশু, নারী এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীসহ দুস্থ অসহায় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষন এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং এ্যাডভোকেসি পরিচালনা। সরকার জাতীয় মানবাধিকার কাঠামো শক্তিশালী করতে এনজিও ও নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর ভূমিকাকে সবসময় স্বাগত জানায়।

গণমাধ্যম

শক্তিশালী ও সদা জাগ্রত গণমাধ্যম মানবাধিকার সুরক্ষা এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি অবিচ্ছেদ্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। গণমাধ্যম যেন পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে পারে সেজন্য বর্তমান সরকার সর্বদাই সচেষ্ট। বর্তমান সরকারের আমলে ১৪টি নতুন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ১৪টি কমিউনিটি রেডিও চ্যানেল এবং ৭টি নতুন বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

নাগরিক

সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন নাগরিক তার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেকেউ সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা চাইতে পারে।

ঙ. আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতা এবং প্রতিশ্রুতিগুলো

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদের মূলনীতি এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঔপনিবেশিকতাবাদসহ বর্ণবাদসহ বর্ণবাদ পরিহার করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে তার প্রতিশ্রুতি পুন্যর্বক্ত করেছে। বাংলাদেশ ১৬টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে চুক্তিবদ্ধ এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব আইনও প্রণয়ন করেছে। ২০০৯-১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত রোম সংবিধি (২৩ মার্চ ২০১০); অভিবাসী শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (২৪ আগস্ট ২০১১); সংঘবদ্ধ আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্ত

কনভেনশন (১৩ জুলাই ২০১১) অনুমোদন করেছে। এছাড়া ওজন স্তর ধ্বংসকারী পদার্থ সংক্রান্ত মন্ট্রিল প্রটোকল, বেইজিং, ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯ (২৪ আগস্ট ২০১০)-এর সংশোধনী অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সবসময়ই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইউপিআর ২০০৯-এর পর জাতিসংঘের গৃহায়ন এবং পানি পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধিকে ২০১৩ সালের প্রথম দিকে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে (সুপারিশ ১২, ইউপিআর ২০০৯)। এই সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশ সিডও এবং সিআরসি কমিটিতে প্রতিবেদন পেশ করেছে এবং ইউএনডিপির সহযোগিতার অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা বিশেষ করে আইসিপিপিআর এবং আইসিইএসসিআর-এর প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ শুরু করেছে (সুপারিশ ৩৯, ৪০ ইউপিআর ২০০৯)।

চ) ইতিবাচক দৃষ্টান্ত এবং চ্যালেঞ্জগুলো

২৩. বাংলাদেশ বিশ্বাস করে যে, সব মানবাধিকারই সমান, প্রত্যেকের জানা প্রযোজ্য, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং আরেকটির উপর নির্ভরশীল। যাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার নেই তারা সত্যিকার অর্থে নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারও ভোগ করতে পারে না। এ কারণে বাংলাদেশ সরকার এ দু'ধরনের অধিকার সুরক্ষার জন্য এমন একটি সুষম দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি জোর দেয়, যার মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টান্তগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়।

ছ) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার

গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ

রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুর্বৃত্ত যারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের উৎখাত করেছিল তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট শিক্ষা নিয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, সংবিধানের অবমাননা বা স্থগিতকরণকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচত হবে।

অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন

২০০৯-১২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশন ১৫টি সংসদীয় উপনির্বাচন এবং কয়েকটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের ৫৫০৯টি নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। প্রতিটি নির্বাচনই অবাধ, সুষ্ঠু এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে, কোথাও কোন অনিয়ম বা ফলাফল নিয়ে কোন অভিযোগ ওঠেনি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন বর্তমানে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছে এবং ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজ চলছে, যাতে প্রায় ৭০ লাখ নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশ সরকার মনে করে, তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৯ সালে নির্বাচন কমিশন ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আয়োজন করে। এর ফলে দীর্ঘ বিরতির পর জেলা পরিষদগুলোতে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে কাজে গতি ফিরে আসে। নবগঠিত সিটি কর্পোরেশনগুলোতে এখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দায়িত্ব পালন করছেন।

২০০৯-১২ সালে ৪ হাজার ৪২১ ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি এবং সদস্য পদে সর্বমোট ৫৭ হাজার ৩৭৩ জন নির্বাচিত হয়েছেন। ৪৮১টি উপজেলায় ১ হাজার ৪৪৩ জন সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং ২৮২টি পৌরসভায় মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন ৩ হাজার ৭৮২ জন। সেই সঙ্গে চারটি সিটি করপোরেশনে চারজন মেয়র ও

১৭১ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে এই সময়ে ৬৩ হাজার ১৯৪ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।

জ. ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

ইউপিআর ২০০৯ এর নিম্ন ও উচ্চ আদালতকে পূর্ণাঙ্গভাবে স্বাধীন করার লক্ষ্যে সরকার ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে দেয় (সুপারিশ ২৫ ইউপিআর)। বিচারিক প্রশাসনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য একটি পৃথক বিচার প্রশাসন কর্মকমশিন, একটি বিচার প্রশাসন কর্ম পে-কমিশন এবং একটি বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ ও সেবা

২০০৯-১২ সালে জাতীয় আইন সহায়তা সেবা সংস্থায় আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৩৪ জন শিশুসহ মোট ৪৬ হাজার ৭৩৭ জনকে আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে। সর্বমোট ১৮ হাজার ৬২৫টি আইন সহায়তা প্রাপ্ত ঘটনার মীমাংসা করা হয়েছে। বিকল্প দ্বন্দ্ব নিরসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার জন্য জাতীয় আইন সহায়তা সেবা সংস্থা সেবাগ্রহীতাদের উৎসাহিত করে থাকে। ২০১০ সাল থেকে দেশের সবক'টি (৬৪টি) জেলায় সার্বক্ষণিক আইন সহায়তাকর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাদেরকে আইন সহায়তা তহবিলের কার্যকর ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে গ্রাম আদালত এবং শহরাঞ্চলে পৌর সালিশ বোর্ডকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে, যেন তারা ছোটখাটো সামাজিক সমস্যা বা অপরাধের মীমাংসা করতে পারে। মামলাজট ছাড়াতে উচ্চ আদালতে ৭১ জন এবং অধস্তন বা নিম্ন আদালতে ১২৫ জন বিচারিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উচ্চ ও নিম্ন আদালতে বিচার প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজড করা হয়েছে।

বিচারহীনতার সংস্কৃতির সমাপ্তি

জাতীয় আত্মচেতনা ও সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গনকে কলুষিত করে রেখেছে এমন বেশ কয়েকটি মামলার বিচার কার্যক্রম সরকার শুরু করেছে (সুপারিশ ১০, ইউপিআর ২০০৯)।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়। এরপর দেশে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং ঐ সময়ের সেনাশাসিত সরকারের রাষ্ট্রপতি খুনিদের দায়মুক্তির অধ্যাদেশ জারি করেন, পরে যেটা উচ্চ আদালত অবৈধ ঘোষণা করেন। পরবর্তী সরকারগুলোও বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করায়নি। ৩৪ বছর পর ২০০৯ সালের নভেম্বরে উচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রায় দেয়ার মাধ্যমে জাতি সেই কলঙ্ক থেকে মুক্তি পায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই রায় এসেছে যথাযথ নিয়মমাফিক একটি স্বাধীন ও স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, কোনো বিশেষ আদালতের মাধ্যমে নয়। যারা হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে রাজনীতির পট পরিবর্তন করতে চায়, তাদের প্রতিহত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করার প্রতি সরকারের সদিচ্ছাকে প্রমাণ করে এই বিচার।

গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার

১৯৭১ সালের গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবাবিরোধী অপরাধসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধের হোতাদের বিচারের আওতায় আনার জন্য দীর্ঘদিন অধীর অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে

সরকার ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে। উল্লেখ্য, বিংশ শতাব্দীর জঘন্যতম গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের অন্যতম এই ঘটনার বিচার আন্তর্জাতিকভাবে সংজ্ঞায়িত অপরাধের আওতায় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইন ১৯৭৩-এর অধীনে একটি দেশীয় আদালতের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। একটি স্বাধীন এবং উন্মুক্ত আদালতের মাধ্যমে, গণমাধ্যম ও স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সবরকম নিয়মকানুন মেনে এই বিচার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষ এবং আসামিপক্ষের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের কার্যপ্রণালী বিধিতে বিচারপ্রার্থী এবং সাক্ষী সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে ৭টি মামলা বিচারাধীন, দুটি চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং একটি মামলার রায় ইতোমধ্যে ঘোষিত হয়েছে।

বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) বিদ্রোহের বিচার

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় ৭৮ জন নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়েছিলেন। ন্যায্যবিচারের স্বার্থে উন্মুক্ত আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করা হচ্ছে। বিদ্রোহের দায়ে এ পর্যন্ত ৬ হাজার ৪১ জন বিডিআর সদস্যদের বিচার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এদের মধ্যে ৫ হাজার ৯২৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। হত্যা ও অন্যান্য অভিযোগে অভিযুক্ত ৮৫০ জনের বিচারকাজ এখনো প্রক্রিয়াধীন। বিদ্রোহের পর বিডিআর বাহিনী পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সংসদে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ পাস করা হয়।

ঝ. স্বচ্ছতা ও শাসন প্রক্রিয়া

সংসদীয় ৫০টি স্থায়ী কমিটি সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের একটি কার্যকরী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং এর ফলে শাসন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ কমিটিগুলো খসড়া বিলসহ অন্যান্য আইন প্রনয়ন প্রক্রিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং আইনের প্রায়োগিক দিকটিও পর্যালোচনা করে। কমিটিগুলো তাদের আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড এবং গুরুতর অভিযোগগুলো তদন্ত করে থাকে এবং প্রয়োজনে মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট যে কাউকে জবাবদিহি করতে পারে।

দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপ

২০০৮-১২ সালের মধ্যে দুদক ৪ হাজার ৭৯০টি দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করেছে এবং ১ হাজার ২১৩ টি দুর্নীতির ঘটনায় মামলা দায়ের করেছে। দুদক ২ হাজার ৮৭টি ঘটনায় অভিযোগপত্র দাখিল করেছে এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করেছে। অতি সম্প্রতি দুদক অবৈধভাবে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও দুদক দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১৪ হাজার ৯৭টি সংহতি জোট গড়ে তুলেছে। প্রতি বছর দুদক ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস এবং ২৬ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করে থাকে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে দুর্নীতি নির্মূলের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত এবং ব্যাপক ভিত্তিক উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য মন্ত্রিসভা ২০১২ সালের অক্টোবরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুমোদন করে।

তথ্য অধিকার

২০১০-১২ সালে তথ্য কমিশন ৩০৬টি অভিযোগ পত্র পায়। এর মধ্যে ১৩৮টি আমলে নেয়া হয়। ১৩৫টি নিষ্পত্তি করা হয় এবং ১৪৬টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় শুধু ২০১১ সালেই ৭ হাজার ৮০৭টি আবেদনপত্র বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়ে, এর মধ্যে ৯৭ শতাংশ আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

২০০৯ সাল থেকে তথ্য কমিশন বিভাগীয় ও জেলা শহরে জনউদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করে আসছে। তথ্য কমিশন আইনের আওতায় আইন কমিশনের কাছ থেকে ২ হাজার ২৯৯ জন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে মোবাইল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো লক্ষাধিক বার্তা পাঠিয়েছে।

নাগরিক সনদ

অধিকাংশ মন্ত্রণালয় এবং সরকারি সংস্থা তাদের পরিসেবাগুলো সর্ম্পকে জনসাধারণকে আরো ভালোভাবে অবহিত করার জন্য এবং সেবাগুলো ঠিকমতো না পেলে কী করণীয় সেগুলো উল্লেখ করে স্ব-স্ব নাগরিক সনদ তৈরি করেছে। এগুলো ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে।

তথ্য প্রদানকারীদের সুরক্ষা

কোনো দুর্নীতি বা অপরাধের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে তথ্য প্রদানকারীদের উৎসাহিত করে থাকে সরকার। কর্তৃপক্ষকে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তৎপরতা সর্ম্পকে অবহিত করা তথ্য প্রদানকারীদের সুরক্ষার জন্য সংসদের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ পাস করেছে।

ই-শাসন

বর্তমান সরকার তাদের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে বাস্তবায়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক একটি নতুন মন্ত্রণালয় স্থাপন করেছে এবং জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৯ পাস হয়েছে। বাংলাদেশ সব ক'টি জেলা, ১৪৭টি উপজেলা এবং প্রায় ৪ হাজার ৭০০ ইউনিয়নে ইন্টারনেটে সেবা চালু হয়েছে। প্রায় ৮ হাজার গ্রামীণ ডাকঘর এবং ৫০০ উপজেলা ডাকঘর ই-সেন্টারে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ আজ এই সেন্টারগুলোকে সরকারি দলিল ও তথ্য পেতে, পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ফলাফল দেখতে এবং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইন সংক্রান্ত তথ্য জানতে ব্যবহার করছে। বর্তমানে দেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবহারের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১ শতাংশে এবং ইন্টারনেটে ব্যবহার ২১.৩ শতাংশে। ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের হার বাড়ছে। ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজড করার একটি কর্মসূচিও হাতে নেয়া হয়েছে।

ঞ. জীবনধারণ এবং স্বাধীনতার অধিকার

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং মানবাধিকার

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সরকার 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি অবলম্বন করে থাকে। কঠোর বিধিমালাসহ একটি সংশোধিত পুলিশ আইন রয়েছে। এছাড়া পুলিশকে অধিকতর গণমুখী করে তোলা হয়েছে, বিভিন্ন মডেল স্থাপন করা হয়েছে এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের জন্য প্রধান পুলিশ স্টেশনগুলো এবং সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। বর্তমান আইন মোতাবেক সেনাবাহিনী বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ব্যক্তিদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় রেহাই পাওয়ার কোনো অবকাশ নেই (সুপারিশ ১০, ইউপিআর ২০০৯)। অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে অপরাধীরা যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা পাল্টা গুলি চালাবে কেবল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং জনগণের জানমাল ও সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা তাদের আচরণবিধি এবং নিয়মকানুন মেনে চলে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আর এ ধরনের হত্যাকাণ্ড এক নয়। কেননা বিচারবর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কোনো আইনগত ভিত্তি বাংলাদেশে নেই (সুপারিশ ২০ ও ১০, ইউপিআর)।

পুলিশ, র‍্যাব এবং অন্য কোন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক বল প্রয়োগ বা গুলিবিনিময়ের ঘটনা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ঘটলেও সেটা যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা তদন্ত করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কোনো সদস্য আচরণবিধি ভাঙলে বা মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত এবং শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা নেয়া

হয়। যেমন ২০১০-২০১২ সালে গুরুতর অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করার দায়ে ১ হাজার ৬০০ র‍্যাব সদস্যের বিচার করা হয়, শাস্তিস্বরূপ জেল, বরখাস্ত এবং চাকরি থেকে সরিয়ে দেয়া হয় (সুপারিশ ২৬, ইউপিআর ২০০৯)। মার্কিন নাগরিকের প্রশিক্ষণ ও সহায়তায় অভ্যন্তরীণ তদন্ত সেল নামে বিশেষ একটি টিম তৈরি হয়েছে, যা র‍্যাব সদস্যদের গুলি বিনিময় সংক্রান্ত ঘটনার তদন্ত করবে।

গত ৫ বছরের তুলনায় ২০০৯-১২ সালে র‍্যাবের সাথে গুলিবিনিময়ের ফলে অপরাধী মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে গেছে (৫৪৬ থেকে ১৮৮)। র‍্যাবের অভিযানের সময়ে আহত মানুষদের দ্রুত এবং যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপরদিকে মোট ৭৭ জন র‍্যাব সদস্য মারা গেছে এবং আরও ২৫০ জন এমন ঘটনায় মারাত্মক রকমের আহত হয়েছেন।

শাস্তি এবং নির্যাতন

সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে, কোনো নাগরিককে কোনোরূপ কারণ না দেখিয়ে গ্রেপ্তার বা সাজা প্রদান করা যায় না। ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য মামলায় উচ্চ আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় পুলিশি গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। অপরাধী কিংবা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পুলিশি হেফাজতে নেয়ার বিষয়টি ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৬০ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হয়। পাশাপাশি ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তদন্ত করতে হয়।

সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে নির্যাতন করা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর শাস্তি প্রদান বা তার প্রতি সে ধরনের আচরণ করা যাবে না। কারাগারে বন্দি আসামিদের নির্যাতনের হাত থেকে সুরক্ষা প্রদানে পিআরবিতে নির্দিষ্ট কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া কারাগারে কোনো রকম নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে বা তেমন অভিযোগ উঠলে তা গুরুত্বের সাথে দেখা হয় এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। জেল সংশোধন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, জেলখানায় শারিরীক নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার আইসিআরসির সহায়তায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও কারা কর্তৃপক্ষের জন্য অ্যাডভোকেসি এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে (সুপারিশ ১০ ও ২০ ইউপিআর ২০০৯)।

কারাগার সংশোধন

অতিরিক্ত কয়েদির কারণে দেশের সমস্ত কারাগারে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত আসামির স্থান সংকুলান হচ্ছে না। ২০০৯-২০১২ সময় বাংলাদেশ সরকার নানা সুযোগ-সুবিধা সংবলিত স্বাস্থ্যকর এবং সুপরিসর কারাগার নির্মাণ করেছে। চারটি নতুন কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং বিচারাধীন আসামীদের জন্য দুটি নির্মানাধীন রয়েছে (সুপারিশ ২০, ইউপিআর ২০০৯)।

কারা কর্তৃপক্ষ জেলখানাকে সংশোধনাগার হিসেবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে, যেখানে দণ্ডপ্রাপ্তরা সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পাবে, সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হবে এবং নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করবে, যেন মুক্ত জীবনে ফিরে তারা সেটি কাজে লাগাতে পারে। প্রতিটি কারাগারে নারী বন্দীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে শিশুরা ৬ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের সাথে থাকার সুযোগ রয়েছে।

নাগরিকদের অপহরণ বা গুম করা

প্রচলিত আইনে ব্যবস্থায় 'গুম' কিংবা 'জোরপূর্বক গুম'-এর কোনো অস্তিত্ব নেই। দণ্ডবিধি বা পেনাল কোডে গুম হয়ে যাওয়াকে আইনি ভাষায় বলা হয় 'অপহরণ করা'। ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে এটি একটি অপরাধ এবং কোনো পুলিশ স্টেশনে এ সংক্রান্ত কোনো রকম অভিযোগ এলে মামলা নিতে এবং তদন্ত করতে কর্মকর্তারা বাধ্য। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত সারাদেশে পুলিশ ২ হাজার ৯৪১টি অপহরণের অভিযোগ গ্রহণ করেছে। ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অপহৃতকে উদ্ধার করতে পেরেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃতদেহ

উদ্ধার করতে পেরেছে। অন্যদিকে র‍্যাব ১ হাজার ৪০০ অপহৃতকে উদ্ধার করতে পেরেছে এবং ৮০০ অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

সাম্প্রতিককালে অপহরণকারী হিসেবে র‍্যাব এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নাম ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। র‍্যাব আজ পর্যন্ত ৫০০ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে, যারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ছদ্মবেশে অপহরণসহ নানা ধরনের অপরাধ করে থাকে।

মৃত্যুদণ্ড

বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে, তবে এর ব্যবহার খুব সীমিত। মারাত্মক অপরাধ ও ঘৃণ্য কয়েকটি অপরাধের ক্ষেত্রে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া এবং বিচারিক সুরক্ষা সাপেক্ষেই কেবল এর প্রয়োগ করা হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে পারে। বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার হার অত্যন্ত কম। ২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। ব্লাস্ট বনাম বাংরাদেশ মামলায় উচ্চ আদালত রায় দেন, যে আইনে অন্য উপায়ান্তর না দেখে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া বাধ্যতামূলক হয়, সেটা সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। (সুপারিশ ১৯, ইউপিআর ২০০৯)

মানব পাচার রোধ

বাংলাদেশ সরকার মানব পাচার এবং এ জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সরকার মানব পাচার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার আইন, ২০১২ ও মানব পাচার প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১২-২০১৪ প্রণয়ন করেছে। (সুপারিশ ১৩, ২৩, ইউপিআর ২০০৯)

মানব পাচার প্রতিরোধকল্পে জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলোকে সমন্বয় করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রতিটি জেলার পুলিশ সদর দপ্তরে রয়েছে মনিটিরিং সেল। অপহৃতদের উদ্ধার, সমাজে পুনর্বাসন করা, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এসব উদ্যোগ গ্রহণের ফলে অপহরণের ক্ষেত্রে মার্কিন স্টেট বিভাগের রির্পোটে ওয়াচলিস্টের দ্বিতীয় ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছে বাংলাদেশ।

আঞ্চলিক পর্যায়ে, পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মানব পাচার প্রতিরোধে ২০০২ সালে স্বাক্ষরিত সার্ক কনভেনশন অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ। নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যৌথ টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। বালি মানব পাচার, মানুষ চোরাচালান ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধ দমন প্রক্রিয়ার বাংলাদেশ একটি সদস্য রাষ্ট্র। মানব পাচার সংক্রান্ত পালের্মো ঘোষণা অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই

বর্তমান সরকার সন্ত্রাস এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপোসহীন অবস্থান গ্রহণ করেছে। গত চার বছরে বাংলাদেশ তার নিজস্ব সীমানার ভেতর অবস্থিত বেশিরভাগ তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ঘাঁটি নির্মূলে সফল হয়েছে। জাতিসংঘের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবিরোধী কৌশলের অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদে সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ এবং অর্থ পাচারবিরোধী আইন, ২০১২ পাস হয়েছে। সরকার ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় সন্ত্রাসবিরোধী কৌশল প্রণয়ন করেছে। সন্ত্রাস দমনের কাজ সমন্বয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটিকোর কমিটি গঠন করেছে।

জাতিসংঘের ১৩টি সন্ত্রাসবিরোধী ব্যবস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করছে। আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিশ্রুতির আলোকে বাংলাদেশ সন্ত্রাস বিষয়ক পারস্পরিক সহায়তা শীর্ষক কনভেনশন অনুমোদন করেছে। সরকার অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন বন্ধে বেশ কিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ও সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

সড়ক দুর্ঘটনা

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে সরকার প্রতি তিন বছর অন্তর জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। সংসদে জাতীয় সড়ক যানবাহন ও ট্রাফিক আইন, ২০১২ প্রণীত হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে সরকার মহাসড়ক পুলিশ নিয়োগ দিয়েছে এবং ট্রমা সেন্টার গড়ে তুলেছে।

সমাবেশের স্বাধীনতা

সংবিধানে প্রতিটি নাগরিককে শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করার ও তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া এক্ষেত্রে কোনো আইনি বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না। ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী মেট্রোপলিটন বা মহানগর এলাকা ছাড়া অন্য যে কোনো স্থানে সমাবেশের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন জেলা ম্যাজেস্ট্রিট। তবে কোনো সমাবেশ যদি বেআইনি রূপ নেয় এবং জননিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তবে পুলিশ আইনসম্মতভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে মতপ্রকাশ, চিন্তা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার দেশের সর্বত্র তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করে। দেশে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ তুলে নেয়া হয়েছে। মানহানির মামলায় গ্রেপ্তার আদেশ সংক্রান্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারাও তুলেও নেয়া হয়েছে, যাতে করে সাংবাদিকরা অযথা হয়রানি কিংবা গ্রেপ্তারের শিকার না হন এবং তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সর্ম্পকে আগে থেকে জানতে পারেন।

সংবাদ সংস্থাগুলো ও গণমাধ্যম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কাজ করছে। সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার সাথে যেসব অপরাধী জড়িত তাদের বিচারের আনার ব্যাপারে সরকার আন্তরিক। আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বন্ধ করা হয়েছে মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ কিংবা ব্যাংক ঋণ পরিশোধে অনিয়মের কারণে।

এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত দেশের মোট প্রিন্ট মিডিয়ার সংখ্যা ৪৬৩টি। সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা পুনর্নির্ধারণের জন্য সরকার ২০১২ সালের জুন মাসে অষ্টম ওয়েজ বোর্ড ঘোষণা করেছে। অধিকাংশ জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার মতো ভিডিও ও মন্তব্য আপলোড করা থেকে বিরত রাখতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সাময়িকভাবে ইউটিউব বন্ধ করে দেয়। গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে সরকার স্বাধীন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সামাজিক গণমাধ্যমের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ট) মানবাধিকার শিক্ষা ও সচেতনতা

জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ সকল পর্যায়ের শিক্ষায় মানবাধিকার শিক্ষার বিধান চালু করেছে। বিচার বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের সদস্যদের জন্য নানা ধরনের সংস্কার ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে (সুপারিশ ২৭, ইউপিআর)। সরকার প্রথম থেকেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকাণ্ডে সমর্থন জুগিয়ে আসছে। ২০০৯ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি মানবাধিকার শিক্ষার প্রসারে নিয়মিত আলোচনা ও সংলাপের আয়োজন করে আসছে। মানবাধিকার সর্ম্পকে নাগরিকদের চিন্তাভাবনা সর্ম্পকে জানতে ২০১১ সালে কমিশন একটি ব্যাপক বেইজলাইন সমীক্ষা পরীক্ষা পরিচালনা করেছে। (সুপারিশ ৯, ইউপিআর ২০০৯)

ঠ. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার

দারিদ্র দূরীকরণ

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সবার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা। দারিদ্র্য নিরসনে ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ বহুমাত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলের কারণে দারিদ্র্যে হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশে কমে আসে। সাম্প্রতিক খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০-এ দেখা যায়, ১৯৯২ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য প্রতি বছর ২.৪৬ শতাংশ হারে কমেছে, যেখানে এমডিজির লক্ষ্যে অনুযায়ী তা ২.১২ শতাংশ হওয়ার কথা। দারিদ্র্য বৈষম্য ৬.৫ শতাংশে (এমডিজির লক্ষ্য অনুযায়ী ৮) নামিয়ে এনে দেশটি ইতোমধ্যে এমডিজি-১ এর সূচকগুলোর একটি অর্জন করেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০১৫ সালের আগেই দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার হার ৫৬.৬ শতাংশ থেকে ২৯ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবে। গত দুই দশকে দেশে মাথাপিছু জিডিপি দ্বিগুণ হয়েছে। গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ৬ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে (সুপারিশ ৩০, ৩৬ ইউপিআর ২০০৯)। কিন্তু এতসব অর্জন সত্ত্বেও দারিদ্র্য নির্মূল এদেশের জন্য এখনও একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

২০০৯-১২ সময়কালে সাড়ে চার লাখ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জাতীয় সেবা প্রকল্পের অধীনে ছয় লাখ যুব নারী-পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৫ হাজার ২৫৪ জনের জন্য সাময়িক কাজের ব্যবস্থা করেছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে বেকার যুবকদের জন্য ১ লাখ টাকার জামানতবিহীন ঋণ দেয়া হচ্ছে। সরকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। (সুপারিশ ৩০, ইউপিআর ২০০৯)

খাদ্য নিরাপত্তা

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন তিন গুণ বেড়েছে। দেশে এখন প্রতি বছর ৩৪ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় এবং ধান উৎপাদনে প্রায় স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে বলা যায়। বর্তমানে দেশে রেকর্ড ১.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য মজুদ আছে। জাতীয় খাদ্যনীতি ও এর কর্মপরিকল্পনা (২০০৮-১৫), দেশীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (২০১০-১৫) প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার খাদ্যের সহজলভ্যতা, অভিগম্যতা ও ব্যবহার-এই তিনটি ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে চায়।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার খোলা বাজারে বিক্রয়, পরীক্ষামূলক ত্রান বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির বরাদ্দ ও আওতা বৃদ্ধি করেছে। এসবের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩০ মিলিয়ন থেকে ৪০.১৭ শতাংশ। ভর্তুকির মাধ্যমে সরকার ন্যায্যমূল্যে ক্রয় কার্ড চালু করেছে, যা জনপ্রতি মাসে ছাড়কৃত দামে ২০ কেজি খাদ্য বরাদ্দ করা হয়।

২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে জনপ্রতি ক্যালরি গ্রহণের হার ২২৩৮.৫ থেকে ২৩১৮.৩-এ উন্নীত হয়েছে। এ সময়কালে প্রোটিন গ্রহণের হারও ৬২.৫ থেকে বেড়ে ৬৬.২৬ হয়েছে। এনজিও এবং সরকারের সমন্বিত কর্মসূচির ফলে উত্তরবঙ্গের মঙ্গা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। (সুপারিশ ৩০, ৩১, ৩৬, ইউপিআর ২০০৯)

সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা

সরকার 'স্বাস্থ্য, জনসেবা ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি' (২০১১-১৬) হাতে নিয়েছে। এ পর্যন্ত সরকার ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছে, যার প্রতিটির উপকারভোগীর সংখ্যা ছয় হাজারের মতো। বাংলাদেশ গ্রাম পর্যায়ে খুব ভালো একটি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে, যাতে রয়েছে ৩ হাজার ৫০০টি

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ৪০৭টি মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট, যেগুলো উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে কাজ চালাচ্ছে।

গত কয়েক দশকে শিশুমৃত্যু রোধে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে (১৯৯০ সালে প্রতি হাজারে ১৪৬ জন থেকে ২০০৯ সালে প্রতি হাজারে ৫০ জন)। বাংলাদেশ বিশ্বের সেই ১৬টি দেশের একটি যা শিশুমৃত্যু রোধে এমডিজি-৪-এর যে লক্ষ্যমাত্রা আছে সেটি অর্জনে সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১০ সালে শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমডিজি পুরস্কার ২০১০ অর্জন করেছেন। মাতৃমৃত্যু হার ২০০১ সালের প্রতি হাজারে ৩২২ থেকে ২০১০ সালে ১৯৪-তে নেমে এসেছে এবং গত ৯ বছরে ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী সাউথ সাউথ পুরস্কার পেয়েছেন নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সফলভাবে তথ্য প্রযুক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের হার ২০১১ সাল নাগাদ প্রতি লাখে ৪৭৫-এ নামিয়ে আনা হয়, যা ২০০৮ সালে ছিল প্রতি লাখে প্রায় ৭৭৬.৯। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে ১.৩৪ শতাংশ ও জন্মনিরোধক ব্যবহারের হার ৬১ শতাংশ। গত দুই দশকে জনগণের গড় আয়ু ৫৯ থেকে ৬৯-এ উন্নীত হয়েছে। (সুপারিশ ৩২, ইউপিআর)

নিরাপদ খাদ্য

ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯-এ অধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। খাদ্যে ভেজালকারী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানে ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকার ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কেমিক্যালমুক্ত খাদ্য বিক্রির জন্য সরকার মেট্রোপলিটন এলাকায় কিচেন মার্কেটেরও উদ্যোগ নিয়েছে।

পানি ও স্যানিটেশন

সরকার দেশে এক লাখ ৩০ হাজার ৮২৩টি আর্সেনিকমুক্ত জলাধার তৈরি করেছে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে প্রতি ৯৫ জনের জন্য অন্তত বিশুদ্ধ পানির উৎস রয়েছে। আর্সেনিকের বিষয়টি বাদ দিলে দেশের ৯৭.৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী উন্নত পানির উৎস ব্যবহার করছে। আর আর্সেনিকমুক্ত পানি হিসাব করলে এ হার প্রায় ৮৬ শতাংশ।

একশ'ভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় স্যানিটেশন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সকলের জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলও প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মুহূর্তে প্রায় ৬৩.৫ শতাংশ মানুষ উন্নত স্যানিটেশন ব্যবহার করে।

গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সরকার দুই পর্যায়ে এক লাখ ৯ হাজার জনকে পুনর্বাসন করেছে। অন্যদিকে একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচির আওতায় এক হাজার ৩৮টি পরিবার সুবিধা ভোগ করেছে। শহরমুখিতা বন্ধে ঘরে ফেরা কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এক লাখ ১১ হাজার ৬৭৩টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে প্রায় ৫২ হাজার হেক্টর খাস জমি বণ্টন করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজধানীর এক হাজার ৬০০ ভাসমান পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। দুস্থদের আশ্রয় ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সংসদে ভবঘুরে ও গৃহহীন আইন, ২০১১ পাস হয়েছে। সরকার রাজধানীসহ অন্যান্য জেলায় নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগণের জন্য বাসস্থান সুবিধা প্রদানের জন্য ৪১ হাজার প্লট এবং ২৫ হাজার ৫শ' ফ্ল্যাট তৈরি করছে।

সবার জন্য শিক্ষা

সরকার সবার জন্য শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দিয়েছে। শিক্ষা খাতের গুণগত পরিবর্তনের সুদুরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণীত হয়েছে। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যের করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে

বিনামূল্যে মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ৭.৮ শতাংশ শিক্ষার্থীকে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের, বৃত্তি প্রদান করা হয়। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তার জন্য সরকার ১০০০ কোটি টাকার একটি ট্রাস্ট ফান্ড তৈরি করেছে।

সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের শিক্ষার জন্য সরকার খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি চালু করেছে। ২০০৪ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়বহির্ভূত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রকল্পের অধীন সাড়ে সাত লাখের বেশি ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের আনন্দ স্কুল নামের ২২ হাজার শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি ও জেন্ডার সমতার এমডিজি-২ লক্ষ্যটি অর্জন করেছে এবং স্কুলে ভর্তির হার বর্তমানে ৯৯.৬৪ শতাংশে পৌঁছেছে।

উপজেলা সেবাকেন্দ্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৩ হাজার ৪৭টি তথ্য প্রযুক্তি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। ২০ হাজার ৫০০ স্কুলে শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার চালু ও ১০৬টি পাঠ্যপুস্তককে ই-বইতে রূপান্তরের ফলে শিক্ষাকে ডিজিটাল করে তোলা সম্ভব হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা চালু করা হয়েছে ও ৩১টি মাদ্রাসায় চারটি ভিন্ন বিষয়ে স্নাতক কোর্স চালু করা হয়েছে।

২০০৯-১২ সময়কালে সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৬৩ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ৪ হাজার ৫০০ সরকারি ও নিবন্ধীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে দেশব্যাপী ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের ফলে এক লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষক সরকারি কোষাগার থেকে তাদের বেতন-ভাতা পাবেন।

পরিবেশ রক্ষা

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সরকারকে পরিবেশ সুরক্ষা, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। সংসদে পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ ও পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধনী) আইন, ২০১০ পাস হয়েছে। ২০০৯-১২ সালে দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ৭টি নতুন জাতীয় উদ্যান ও ৮টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য তৈরি কার হয়েছে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি আন্তর্জাতিক প্রশংসা লাভ করেছে। নৌ পথের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য সরকার একটি বড় ড্রেজিং কর্মসূচি প্রশংসা হাতে নিয়েছে। মন্ত্রি পরিষদে সম্প্রতি খসড়া জাতীয় নদী সুরক্ষা কমিশন আইন, ২০১২ অনুমোদিত হয়েছে।

জাহাজ ভাঙাকে সরকার একটি শিল্পখাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। ক্ষতিকর পদার্থের সংস্পর্শে আসা নিয়ন্ত্রণ, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে তথা শ্রম আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাহাজ ভাঙা ও পুনরুৎপাদন বিধি, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে প্রায় কোনো ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকা দেশগুলোর অন্যতম। বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও ভয়াবহতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ প্রতিবছর ১.৫ শতাংশ জিডিপি হারায়। প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী এক মিটার উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ তলিয়ে যাবে। এর ফলে ২১ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় ৩০কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হবে।

সরকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও পরিকল্পনা, ২০০৯ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন অভিযোজন ব্যবস্থা যেমন– বন্যা, খরা ও লবনাক্ততা সহনশীল শস্য উৎপাদন, সাগরের তীরে বাঁধ ও বনায়ন, সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সংসদে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ পাস হয়েছে, যার আলোকে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা তহবিল গঠন করেছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর ফোরামের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হয় এবং জলবায়ু ঝুঁকি পরিবীক্ষণ, ২০১২-এর আয়োজন করে।

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়ে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর সাথে আরও আলাপ-আলোচনা উৎসাহিত করতে ২০১২ সালে বাংলাদেশ ফিলিপাইনের সাথে যৌথভাবে মানবাধিকার পরিষদের জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার শীর্ষক প্রস্তাব গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছে (সুপারিশ ৪১, ইউপিআর ২০০৯)।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ প্রস্তুতি, ঝুঁকি মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনায় সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংসদে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ পাস হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্যাপকভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। সাইক্লোন প্রস্তুতি কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৪২ হাজার কমিউনিটিভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী তৈরি করা হয়েছে, যারা জরুরি অবস্থায় কাজ করবে। উপদ্রুত অঞ্চল থেকে মানুষজনকে সরিয়ে নেয়ার জন্য ২০০৯-১২ সালে ৫০০টি মাল্টি পারপাস/বহু ব্যবহার উপযোগী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদানের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আবহাওয়া ও মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড ও অন্যান্য দুর্যোগের সময় যথাযথভাবে কাজ করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট দুই লাখ ২৭ হাজার ৫০৫.৫ মিলিয়ন ব্যয় করেছে, যা জিডিপির ২.১৮ শতাংশ এবং বাজেটের ১১.৮৭ শতাংশ। বর্তমান সরকার তার প্রথম মেয়াদে বৃদ্ধ, বিধবা ও মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ অসহায় নারী ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতার উপকারভোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেছে।

সরকার জুন ২০১১ পর্যন্ত পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন বা পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে ২৪০৪.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে ৬৬৩১৮৭০ জন গ্রহীতার মধ্যে, এর উপকারভোগীদের মধ্যে ৯১.২৯ শতাংশই নারী (সুপারিশ ৩০,৩৫, ইউ পি আর ২০০৯)।

ড. যেসব জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন

শিশু

বাংলাদেশ ২০০৯-১২ সালে জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১ গ্রহণ করেছে। যেসব বিষয় মাথায় রেখে এ নীতিটি প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে আছে বৈষম্যহীনতা, শিশুর সর্বাধিক মঙ্গল, শিশুর অধিকার রক্ষায় তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া। সরকার একটি জাতীয় শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ও প্রাক-শৈশব পরিচর্যা ও বিকাশ নীতিমালা তৈরি করছে। জাতীয় শিশু নীতি, ২০১২ চূড়ান্তকরণের শেষ পর্যায়ে আছে। শিশু অধিকার সনদের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় শিশুনীতিতে শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সের যে কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে (সুপারিশ ১৬, ইউপিআর ২০০৯)।

জাতীয় শিশুনীতির যথাযথ বাস্তবায়নে শিশু ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে (সুপারিশ ১৩, ইউপিআর, ২০০৯)। শিশু অধিকার সনদের ২১ অনুচ্ছেদে বিদ্যমান সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকার মনে করে, এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য প্রচলিত দেশীয় আইন, বিশেষ করে সন্তান ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৮৬০ দ্বারাই বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

জাতীয় শিশুশ্রম বিলোপ আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি ২০১৬ সাল নাগাদ দেশে বিভিন্ন পেশায় শিশু শ্রমিকদের ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে এবং ক্ষতিকর কাজের তালিকা করা হয়েছে একপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে (সুপারিশ ২২, ইউপিআর ২০০৯)। এসব কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি শিশুশ্রম বিভাগ খোলা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ধরনের শাস্তি বন্ধের লক্ষ্যে দায়ের করা রিট পিটিশনের (নং ৫৬৮৪/২০১০) পক্ষে উচ্চ আদালত রায় দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সরকার পরিপত্র জারি করে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ধরনের শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে। ৫৯১৬/২০০৮ নং রিট পিটিশনের জবাবে উচ্চ আদালত যৌন হয়রানি থেকে শিশুদের সুরক্ষার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন (সুপারিশ ১৬, ২১,২৩ ইউপিআর ২০০৯)।

শিশু অধিকার সনদের আলোকে কিশোর অপরাধীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে খসড়া জাতীয় শিশু আইনে সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৮ বছর পর্যন্ত অপরাধীদের জেলে পৃথক ওয়ার্ডে রাখা হয় এবং এদের অধিকাংশকেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয় (সুপারিশ ১৬, ইউপিআর ২০০৯)। কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নে ও তাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে দেশের ৭টি বিভাগকে শহরে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

নারী

বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছে। জাতীয় সংসদে ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। নারীরা ৩০০টি সাধারণ আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সংসদ নেতা, বিরোধী দলীয় নেতা ও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন নারীরা। স্থানীয় সরকারের এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারীরা সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন। (সুপারিশ ৩৭, ইউপিআর ২০০৯)

নারীদের অধিকতর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ও তাদের প্রতি সব ধরনের বৈষম্য এবং নির্যাতন বন্ধে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ ঘোষিত হয়েছে। নারী ও শিশুদের সব ধরনের পারিবারিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারিবারিক নির্যাতন (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এ কঠোর বিধিবিধান যুক্ত করা হয়েছে। পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ নারী ও শিশুদের ব্যবহার করে যে কোনো ধরনের পর্নোগ্রাফি তৈরি, প্রচার ও বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সরকার ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। সরকার নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য সরাসরি বাজারজাতকরণের জন্য রাজধানীতে একটি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেছে। আনুষ্ঠানিক শ্রম খাতে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সরকার বেতনভাতা ও মাতৃত্বকালীন ছুটির সুযোগ ও জেন্ডার সংবেদনশীল শ্রম আইন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে মনিটরিং দল গঠন করেছে (সুপারিশ ১৩, ইউপিআর ২০০৯)। সরকার সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করেছে (সুপারিশ ১৫, ইউ পিআর ২০০৯)। বেসরকারি খাতেও এ নীতি পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০১১-১২ সালে এক লাখ এক হাজার ২০০ কর্মজীবি নারী, বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা ও প্রসূতি নারীদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নাগরিকত্ব আইন (সংশোধনী), ২০০৯ বিদেশীদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ বাংলাদেশী নারীদের তাদের সন্তানের নাগরিকত্ব অর্পণের অধিকার প্রদান করেছে। ২০১০ সালে সরকার শিশুর পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে মায়ের নাম উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করেছে (সুপারিশ ১৫, ইউপিআর)।

সিডও সনদের অনুচ্ছেদ ২ এর ওপর থেকে আপত্তি প্রত্যাহারের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। অন্যদিকে ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর সাথে আলাপ-আলোচনা করে ১৬.১ (গ) অনুচ্ছেদ থেকে আপত্তি প্রত্যাহারের ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে (সুপারিশ ৩, ইউপিআর ২০০৯)।

নারীর প্রতি সহিংসতা

বাংলাদেশ সরকার নারী নির্যাতন থেকে সুরক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে পরিচালিত সব কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সেল পরিচালনা করছে এবং নির্যাতনের শিকারদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা বৃদ্ধি করেছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমানে নির্যাতিতদের আইনি, চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং কাউন্সেলিং সহায়তা দেয়ার জন্য একটি হেল্পলাইন (১০৯২১) চালু করেছে।

নির্যাতনের শিকার নারীদের চিকিৎসা সেবা, আইনি সহায়তা, আশ্রয় এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের জন্য ৭টি বিভাগীয় শহরের প্রতিটিতে একটি করে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক ভিকটিমের মনো-সামাজিক কাউন্সেলিংয়ের জন্য একটি জাতীয় ট্রমা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ভিকটিমদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দক্ষতা উন্নয়ন ও আইনি সহায়তা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

নারী পুলিশ সদস্যদের নিয়ে পুলিশ সদর দপ্তর এবং চারটি পুলিশ স্টেশনে একটি 'বিশেষ সেল' গঠন করা হয়েছে, যেখানে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তা করা হয় ও অভিযোগ দায়ের করা যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয় একটি 'এসিড মামলা মনিটরিং সেল গঠন' করেছে, যাতে অপরাধীর সাজা প্রদানের আইনি প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা যায়। এসিড আক্রান্ত নারী ও মেয়েদের সহায়তায় সরকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেছে। কিশোরী মেয়েদের বিশেষ করে ছাত্রীদের রাস্তাঘাটে বখাটেদের উত্ত্যক্ত ও হয়রানি থেকে রক্ষা করতে সরকার ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯-এ এটিকে অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে সংক্ষিপ্ত বিচারের বিধান চালু করেছে। জাতীয় ডিএনএ প্রোফালিং ল্যাবরেটরি ধর্ষণ এবং অন্যান্য হিংসাত্মক অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করেছে।

২০১১ সালের মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ফতোয়ার নামে কোনো ব্যক্তির ওপর শাস্তি চাপিয়ে দেয়াকে অবৈধ ঘোষনা করেছেন। বাংলাদেশ সরকার ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পর্যালোচনার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার বিয়ের সময় বর-কনের জন্মনিবন্ধন সনদ অথবা জাতীয় পরিচয় পত্র উপস্থাপন বাধ্যতামূলক করতে দেশের সব বিয়ে নিবন্ধনকারীকে নির্দেশ দিয়েছে। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০-এর কঠোর প্রয়োগের ফলে এখন যৌতুক অনেক কমে গেছে। (সুপারিশ ১৫ ,১৬ ইউপিআর ২০০৯) [সংযুক্তি-৩]

ধর্মীয় সংখ্যালঘু

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি মূলনীতি হিসেবে ফিরিয়ে এনেছে এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খিষ্টান ও অন্য ধর্মের মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। সব ধর্মের মূল উৎসবের দিনগুলোতে সরকারি ছুটি থাকে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এগুলো পালিত হয়। বাংলাদেশ সরকার হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টানদের জন্য আলাদা ধর্মীয় কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ করে থাকে। বর্তমান সরকার মনে করে, 'প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার আছে, তবে উৎসব সবার জন্য।' (সুপারিশ ২৯, ইউপিআর ২০১২)

হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের অর্পিত সম্পত্তি ফেরত দেয়ার নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধিত) আইন, ২০১০ পাস হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহিত নারীদের বিয়ে নিবন্ধনসহ আইনি সুরক্ষার জন্য সংসদে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্ষমতাসীন সরকার ২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মারধর, ধর্ষণ, বাড়িঘর লুট, আগুন লাগানো ইত্যাদি ঘটনার তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেছে। কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম শুরু করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে (সুপারিশ ১৭, ইউপিআর ২০০৯)।

বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালের নভেম্বরে কক্সবাজার জেলার রামু ও এর নিকটবর্তী এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোরতম অবস্থান নিয়েছে। সরকার তাৎক্ষণিকভাবে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে, আক্রান্ত এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করেছে, দোষীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং দায়িত্বে অবহেলার দায়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। সরকার আক্রান্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের জন্য নগদ অর্থ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় উপসনালঢগুলো পুনর্নির্মাণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের নিয়ে আস্থা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, উপজাতি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যে আলাদা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে সেটাকে রক্ষা এবং উন্নয়নে রাষ্ট্র ভূমিকা পালন করবে। এর অংশ হিসেবে সরকার পাহাড়ি ও সমতলের সকল নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষা, ধর্মীয় আচার ও প্রচলিত জীবনাচরণ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সংগঠন আইন, ২০১০ প্রণয়ন করেছে। সরকারি খাতের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা রয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩২৫টি আসন সংরক্ষিত আছে। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালে ইউনেস্কোর 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য' পদক পান।

বাংলাদেশ আইএলও সনদের আদিবাসী এবং উপজাতি জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত ১০৭ নং অনুচ্ছেদে স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৯ সালে আদিবাসী এবং উপজাতি জনগোষ্ঠী সর্ম্পকিত আইএলও সনদের ১৬৯ নং অনুচ্ছেদের ওপর অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় অংশ নিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাস্তবায়ন

দেশের তিন পার্বত্য জেলায় শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পূর্ববর্তী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, ১৯৯৭ স্বাক্ষর করে। ২০০৯ সালে সংসদ উপনেতাকে সভাপতি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সমন্বিত উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

এ পর্যন্ত পার্বত্য শান্তি চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৫টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯টি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আছে। প্রস্তাবিত ৩২টি বিভাগের মধ্যে এখন পর্যন্ত তিন ভাগের দুই ভাগ (২৩টি) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে স্থানান্তরিত হয়েছে। ২৩৮টি সেনা ক্যাম্প ইতোমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সরকার ভূমি কমিশন আইন, ২০০১ পর্যালোচনা এবং সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাথাপিছু উন্নয়ন ব্যয় হচ্ছে জাতীয় গড়ের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি। ১৯৯৭ সাল থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৬,৪৭০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাগুলোতে পর্যন্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদানের জন্য ৩ হাজার ৫০০টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। [পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চুকিত বাস্তবায়ন পরিস্থিতি বিষয়ে সংযুক্তি-৪] (সুপারিশ ৩৪, ইউপিআর ২০০৯)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অটিজম এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধীকতার শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও চিকিৎসার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সরকার জাতীয় প্রতিবন্ধী জরিপ, ২০১১ সম্পন্ন করেছে এবং অন্য আরো উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গত তিন বছরে ৩৫টি বিশেষ সহযোগিতা ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০১২ এর খসড়া খুব শিগগিরই গৃহীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৫৫টি বিশেষায়িত স্কুলের মাধ্যমে ১৩ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রথমবারের মতো সব প্রথমশ্রেণীর সরকারি চাকরিতে শতকরা ১ ভাগ প্রতিবন্ধী কোটার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিবন্ধী আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার সমাজসেবা বিভাগের মাধ্যমে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা চালু করেছে। ২০০৯-১২ সালে ৩০ লাখ দরিদ্র প্রতিবন্ধীর পেনশন ভাতা এবং ২০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বহুমুখী সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কমপ্লেক্স স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ভ্রাম্যমান থেরাপি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। (সুপারিশ ৮, ইউপিআর ২০০৯)

সরকার দেশের সব কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে অটিজম পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে এবং অটিজম সংক্রান্ত প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন অটিজমের জন্য একটি বিশেষ রিসোর্স সেন্টার চালু করেছে এবং মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৭টি বিশেষ স্কুলসহ মোট ৪৮টি স্কুল পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ ২০১২ সালে অটিজম নিয়ে প্রথম বৈশ্বিক গণস্বাস্থ্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং অটিজম ও অন্যান্য প্রতিবন্ধিকতা বিষয়ক জাতিসংঘে গৃহীত প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করে।

প্রবীন /বয়স্ক ব্যক্তি

বর্তমান সরকার প্রবীণ, বিশেষ করে দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তিদের সুরক্ষা এবং কল্যাণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। শুধু ২০১১-১২ অর্থবছরেই বাংলাদেশ সরকার বয়স্ক ভাতা হিসেবে ৪৭ লাখ ৬০ হাজার সুবিধাভোগীর জন্য (৬৫ বছর ও তার বেশি বয়সী)-দের জন্য ৮কোটি ৯১ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছে। এক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং পরিবার থেকে পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়েছে। এ তহবিলের ৯৫ শতাংশ উপকারভোগীদের মধ্যে সফলভাবে বিলি করা হয়েছে। (সুপারিশ ৩০, ইউপিআর ২০০৯)

শ্রমিকের অধিকার

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতের কর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণকে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০০৯-১২ সালে সরকার ৩৮টি বেসরকারি খাতের শ্রমিকের মজুরি পুনর্নির্ধারণ করেছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের নিম্নতম মাসিক মজুরি ৩০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে।

জাতীয় সংসদে ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ আইন সংগঠন ও শিল্প সম্পর্ক আইন প্রণয়ন করেছে। শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী তৈরি পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন চালুর ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। সরকার আইএলওর সহযোগিতায় 'উন্নত শ্রম কর্মসূচি'র প্রস্তুতিপর্বের বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এর আওতায় তৈরি পোশাক খাতে সংগঠন করা ও সম্মিলিত দর কষাকষির অধিকার নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যনীতির খসড়া প্রস্তুত করেছে, যা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। কর্মক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। একটি সমন্বিত পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ও ফ্যাক্টরি ব্যবস্থাপকদের অগ্নিনিরাপত্তা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সিভিল ডিফেন্স ও ফায়ার সার্ভিস গার্মেন্টস খাতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

অভিবাসী শ্রমিক

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম অভিবাসী শ্রমিক প্রেরণকারী রাষ্ট্র। সরকার গত চার বছরে অভিবাসী শ্রমিকের সুরক্ষাকে একটি অগ্রাধিকার নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। ২০০৯ সাল থেকে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ২০ লাখ ৪০ হাজার হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশে প্রায় ৪ হাজার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আসছে, যা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সংসদ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ প্রণয়ন করেছে, যার মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

সরকার বিদেশে অভিবাসনের ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে যেসব দেশে শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে তার মধ্যে আছে অভিবাসী শ্রমিকদের শোষণ বন্ধ করা, বিশেষ করা নারীদের। স্বল্প দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের বৈধ অভিবাসন ও নিরাপদ অভিবাসন বিধিমালার জন্য সরকার মালয়েশিয়া সরকারের সাথে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশের সাথে শ্রমিক নিয়োগের একটি মডেল চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ সরকার নিয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা চলছে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো প্রবাসীদের আইন ও কল্যাণ সহায়তা প্রদান করছে। সরকার বিদেশ গমনেচ্ছু নারী অভিবাসী শ্রমিকদের যথাযথ তথ্যসেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য দেশের প্রথম রিসোর্স সেন্টার তৈরি করেছে।

সরকার অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নিয়ে আসতে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে। অভিবাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বৈশ্বিক ফোরামগুলোতে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশ এশিয়ার প্রধান প্রধান অভিবাসী শ্রমিক প্রেরণকারী শ্রমিকভিত্তিক দেশগুলোর আঞ্চলিক 'ফোরাম' কলম্বো প্রসেসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে। ২০১৫ সালে পরবর্তী জনসংখ্যা শক্তি সংক্রান্ত বৈশ্বিক আলোচনা বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজন করবে ২০১৩ সালের মার্চে। (সুপারিশ ৩৬, ৩৮,৩৯,৪১ ইউপিআর)।

সামাজিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠী

২০০৯-১২ সময়কালে সরকার বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (যেমন-হিজড়া, দলিত) প্রতি বৈষম্য ও অমর্যাদা থেকে সুরক্ষা প্রদানে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিশেষ পদগুলোতে তাদের জন্য কমপক্ষে ৮০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দিয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে গৃহায়ন কর্মসূচিতেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (সুপারিশ ১৮)

২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে হিজড়া, বেদে ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ১৬৭.৫ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দিয়েছে (সুপারিশ ২৭, ইউপিআর ২০০৯)। সরকার যৌনকর্মী, এমএসএম (সমকামী পুরুষ) ও ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের জন্য এইচআইভি/এইডস কর্মসূচি পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সরকার এনজিওদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

শরণার্থী

জাতিসংঘের ১৯৫১ সালের শরণার্থী বিষয়ক কনভেনশন ও ১৯৬৭ সালের প্রটোকলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেনি। তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বাংলাদেশ গত তিন দশকে মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দায়িত্ব নিয়েছে।

ইউএনএইচআর-এর সাথে চুক্তির মাধ্যমে সরকার কক্সবাজার জেলার দুটি শরণার্থী ক্যাম্পে প্রায় ২৯ হাজার শরণার্থীর দেখভাল করছে, যার বার্ষিক ব্যয় প্রায় ৪৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইতিপূর্বে মায়ানমার সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ১৯৯১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ইউএনএইচসিআর-এর সহায়তায় প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী স্বেচ্ছায় প্রর্ত্যাবর্তন করেছে। বাদবাকি শরণার্থীদের স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে ২০০৯-১২ সময়কালে মায়ানমার সরকারের সাথে আলোচনা গভীরতর করার জন্য বর্তমান সরকার বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে (সুপারিশ ১৮, ইউপিআর ২০০৯)। তবে আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রবেশে ইচ্ছুক আরো রোহিঙ্গা শরণার্থীর দায়িত্ব নেয়া বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়।

ঢ. কাঠামোগত সংস্কার

স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বেশ কিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যা দেশের সকল মানুষের পূর্ণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক। কয়েকটি মূল সমস্যা হলো দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সক্ষমতার অভাব, দাতাগোষ্ঠীর নীতির সাথে জাতীয় অগ্রাধিকারের পার্থক্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষার অভাব ও আইন প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা।

ণ. ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি

ইউ পি আরে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- যেসব আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে সেগুলো বাস্তবায়নে জাতীয় আইন প্রণয়ন করা;

- জাতিসংঘের বিশেষ ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং বিশেষ প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো;
- নারী ও শিশুসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া;
- মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা;
- সংসদ সদস্য, বিচারিক, সরকারি কর্মচারী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের মানবাধিকার প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি শক্তিশালী করা;
- উন্নয়ন অধিকারকে একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং উন্নয়নের নতুন নতুন ধারণা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানবাধিকারের সম্পর্ক তুলে ধরা;
- এনজিও, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতকে ইউপিআর-এর পরবর্তী কর্মসূচি বাস্তবায়নে ও সকল পর্যায়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত করা।

দ্বিতীয় সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতিতে (ইউপিআর) বাংলাদেশের 'কোয়ালিশন অফ ইন্ডিজেনাস পিপলস্ অর্গানাইজেশনস' এর প্রতিবেদন

ভূমিকা এবং পদ্ধতি :

১. বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সুরক্ষা বিষয়ে ১৭টি আদিবাসী সংগঠনের সমন্বয়ে ২০১২ সালের জুন মাসে গঠিত বাংলাদেশের আদিবাসী সংগঠনগুলোর সম্মিলিত জোট একযোগে মানবাধিকার কাউন্সিলের ইউপিআর ওয়ার্কিং গ্রুপের কাছে প্রতিবেদন পেশ করে।

২. প্রতিবেদনটি ২০০৯ থেকে ২০১২ সময় জুড়ে আদিবাসীদের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু যেমন বাংলাদেশের আদিবাসীদের তাদের পৈতৃক ভূমি রক্ষার জন্য সংগ্রাম, নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা, তাদের অবাধে চলার স্বাধীনতা, অতঃপর তাদের ভূমি ও উন্নয়ন বিষয়ে স্বাধীন পূর্বাবহিতকরন সম্মতি এবং তাদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারসহ আদিবাসী নারী ও শিশুদের অধিকারের উপর ফোকাস করে। প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাধ্যবাধকতা পূর্ববর্তী ইউপিআর অধিবেশনে বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুতকৃত সুপারিশসমূহ এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং সর্বশেষ মানবাধিকার বাধ্যবাধকতার অভিযোগ অনুসারে কিছু সুপারিশ পূরণ করা হয়।

৩. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪৫টির অধিক আদিবাসী জাতির ২০ লক্ষের অধিক (মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ ভাগ) নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে আদিবাসীরা দাবি করেন তাদের সংখ্যা ৫৪টির অধিক জাতির ৩০ লক্ষের অধিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে আদিবাসী অধ্যুষিত দেশের একমাত্র অঞ্চল। আদিবাসীরা প্রধানত রাজশাহী, দিনাজপুর, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বৃহত্তর সিলেট, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলায় বাস করে।

৪. বাংলাদেশের সংবিধান পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকার করে না। ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার একদিকে যেমন আদিবাসীদেরকে উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করেছে, অন্যদিকে জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুসহ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে বাঙালি বলে গণ্য করা হয়েছে। (আর্টিকেল ৬২)

২০০৯ সালের ইউপিআর সুপারিশসমূহের পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির বাস্তবায়ন ও অনুস্বাক্ষর:

সুপারিশ ২ (মেক্সিকো): আদিবাসী ও ট্রাইবেলদের জন্য আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করা।

বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া: যদিও আদিবাসী ও ট্রাইবেলদের জন্য আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ এখনও অনুস্বাক্ষর করা হয়নি, পার্বত্য চট্টগ্রামের ট্রাইবেলরা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি অনুযায়ী আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ এর ইতিমধ্যে অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেছে। বর্তমান সরকার দেশের সংবিধানের কাঠামোর ভেতরে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

৫. বাংলাদেশ সরকার আদিবাসী ও ট্রাইবেলদের জন্য আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ অনুস্বাক্ষর করেছে কিন্তু তার সংশোধিত সংস্করণ আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ এখনো অনুমোদিত হয়নি। যদিও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার এটা বিবেচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এর ধারাগুলো বাস্তবায়নের অবস্থা খুবই নাজুক যেটা প্রধানত প্রশাসন, ভূমি, শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, চাকুরি, ভাষার অধিকার, সবকিছুই সুসংহত করে যেগুলো বাংলাদেশের আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ঐতিহ্যগতভাবে ভূমির উপর আদিবাসীদের সমষ্টিগত এবং স্বতন্ত্র অধিকার, শিশুদের তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার (পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক) আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ইত্যাদির বাস্তবায়ন করা হবে।

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের বিশ্ব আদিবাসী দিবসের শুভেচ্ছা বার্তায় জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের জন্য যৌথভাবে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন এছাড়াও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (পৃষ্ঠা ৪২৫) এটার পুনরাবৃত্তি করা হয়– বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে দেশে কোনও আদিবাসী নেই মর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা প্রদান করে।

৭. বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র্যের কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছে যেটা আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং পারিবারিক সম্পত্তির সুরক্ষা এবং সেগুলোর ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের (আর্টিকেল ৮জে ও ১০সি) ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ পূর্বোল্লিখিত শর্ত এখনো বাস্তবায়িত হয়নি বিশেষ করে সমতল অঞ্চলে।

৮. আদিবাসী সংগঠনগুলোর সম্মিলিত জোট জাতীয় সংসদে চাপসৃষ্টি করার জন্য সংসদ সদস্যদের দ্বারা গঠিত গ্রুপ আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের গৃহীত উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে এটি আদিবাসীদের বংশানুক্রমিক জায়গা-জমি,স্বশাসন, সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা, সামাজিক ন্যায়বিচার একত্রিত করে বাংলাদেশে আদিবাসী অধিকার আইন পাশ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের বিধান মেনে আদিবাসীদের জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠন করার জন্য প্রস্তাব করেছে।

৯. আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ রেপোটিয়ার ২০১০ সালে বাংলাদেশ সফরের সম্মতির জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট অনুরোধ করেছে কিন্তু কোন ইতিবাচক সাড়া দেওয়া হয়নি।

খ. ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন

সুপারিশ নম্বর ৩৪ (নরওয়ে ও অস্ট্রেলিয়া): অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সময় সূচি নির্ধারণ করা।

বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া: চুক্তির বেশির ভাগ ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকি ধারাগুলো খুব শীঘ্রই অল্প সময়ের মধ্যে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ বর্তমান সরকারের সময়ের প্রথম দিকে নেয়া হয়। তার মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চেয়ারপারসন নিয়োগ প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে একজন আদিবাসী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ৩৫টি অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পসহ একটি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স সরিয়ে নেয়া অন্যতম। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ চুক্তি অনুসারে আদিবাসীদের শিক্ষার চাহিদা বিবেচনা করে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে। তবে আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরাম দ্বারা নিযুক্ত বিশেষ রেপোটিয়ারের ১৯৯৭ সালের চুক্তির বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনায় লক্ষণীয় যে চুক্তির বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখনো অবাস্তবায়িত রয়েছে বা শুধুমাত্র আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলো নিচে দেওয়া হল:

ক. বাংলাদেশ সরকার দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে এবং দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে রুপরেখা প্রণয়ন করা হয়নি।

খ. পার্বত্য চুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ অনুযায়ী ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। বিপরীতক্রমে অবাধে সরকারি সুবিধাপ্রাপ্ত সেটেলার দ্বারা ভুমি দখল, বহিরাগত লোকজন এবং কোম্পানি দ্বারা জমি অধিগ্রহণ এবং অবাধে অভিবাসনের

কারণে আদিবাসীরা ক্রমেই সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক হয়ে পড়ছে এবং তাদের পূর্বপুরুষের ভূমিতে তারাই অনিরাপদ বোধ করছে।

গ. সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শ করে রুলস অব বিজনেস অনুমোদনসহ পরিষদকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করার জন্য দ্রুত আইন প্রণয়ন করতে হবে। পরিষদের সাথে আলোচনার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক অনেক আইন যেমন বন আইন ২,০০০ (সংশোধিত) ও ২০১২, বন্য প্রাণী সংরক্ষন আইন ২০১২ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ তাদের সাথে আলোচনা না করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঘ. আইন-শৃঙ্খলা, স্থানীয় পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও বনসহ বিভিন্ন বিভাগ এবং বিষয় উন্নয়ন অথবা জেলা পরিষদে হস্তান্তর জটিলতার কারণে এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। নারী এবং সংখ্যালঘু আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব একেবারে বাদ দেয়া হয়েছে।

ঙ. ২০০৯ সালে যদিও ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া হয়েছে কিন্তু এখনও ৩০০ অধিক অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়ে গেছে। অপারেশন উত্তরণের (অপারেশন উত্তোলন) নামে কার্যত সামরিক শাসন চালু আছে যেটা বেসামরিক বিষয়ের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্ত করে, যা যথাশীঘ্রই প্রত্যাহার করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

চ. ১৯৯৭ সালের চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ২০০১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধনে সরকারের অঙ্গীকার অপূর্ণ রয়ে গেছে। প্রস্তাবিত সংশোধনী এখনো অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি।

ছ. শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বিষয়ক টাস্কফোর্স এখনো কার্যকর করা হয়নি, ভারত প্রত্যাগত ১২,২২২ আদিবাসী শরণার্থী পরিবারের মধ্যে ৩০০০ এবং অভ্যন্তরীণভবে উদ্বাস্তু ৯০২০৮ পরিবারকে এখনো তাদের নিজস্ব জায়গা জমি ফিরিয়ে দেয়া হয়নি।

জ. বর্তমান সরকারের সময়েই ইজারা শর্তাবলী না মানার কারণে অ-আদিবাসী, বহিরাগত কোম্পানী এবং ব্যক্তি মালিকানায় রাবার এবং অন্যান্য বনায়নের জন্য ইজারাকৃত ২,০০০ টি প্লটের মধ্য থেকে প্রায় ৫৯৩ টি প্লটের ইজারা বাতিল করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি বান্দরবানের জেলা প্রশাসক বাতিলকৃত বেশির ভাগ প্লট তার মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বন্দোবস্তীর আইনগত নিষেধাঙ্গা থাকা সত্ত্বেও জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্দোবস্তী অব্যাহত রয়েছে, বিশেষ করে বান্দরবান জেলায়।

১১. ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকারের প্রতিনিধি দলটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দিতে পারবে না যেহেতু এটি সংবিধান সংশোধনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলশ্রুতিতে সাংবিধানিক সুরক্ষা না থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এবং জেলা পরিষদ আইনের ১৯৮৯ (সংশোধিত ১৯৯৮) কিছু ধারা হাইকোর্ট কতৃক অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করা হয় (রিট আবেদন ২৬৬৯/২০০০)। **পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দাবিকে উপেক্ষা করে সংসদের ১৫তম সংশোধনীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য** সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং তার আইনসমূহের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি।

গ. মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতি

সুপারিশ ২৬ (অস্ট্রেলিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র ও জার্মানী): আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কতৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়মুক্তির সংস্কৃতি মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা; নিরাপত্তা বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ সকল প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়মুক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা (চেক প্রজাতন্ত্র); দায়মুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং বেসামরিক লোকের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের জন্য দায়ী সকল কর্মকর্তা ও ব্যক্তিদেরকে অব্যাহতি দেওয়া (জার্মানী)।

বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া: সরকার এধরনের কাজকে সমর্থন করে না এবং এ ধরনের কাজে কোনো সরকারি কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তাকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

১২. সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি কর্তৃক ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘন, আদিবাসী সম্প্রদায়কে প্রান্তিকীকরণ এবং অন্যান্য অনাচারের মাধ্যমে আদিবাসীদের উপর অন্যায় করা হচ্ছে। নারী ও শিশুদের ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ভূমি দখল, অবৈধ গ্রেফতার ও নির্যাতন এবং জাতিগত, ধর্মীয় ও জেন্ডারের ভিত্তিতে কাঠামোগত বৈষম্য অন্যতম। সরকার আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধ করার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যুদ্ধ বা বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রের জরুরী অবস্থা বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর উপস্থিতি অব্যাহত থাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি প্রধান কারণ। সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত সরাসরি মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি উদাহরণ ২০১১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বান্দরবানের দুই কারবারীকে (গ্রাম প্রধান) বড় মোদক বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার দ্বারা অমানবিক নির্যাতন। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলায় সময় নিরাপত্তা বাহিনী প্রায়ই সরাসরি অথবা মৌন সম্মতির মাধ্যমে সেটেলার বাঙালিদের সহযোগিতা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ২০১০ সালের ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইহাটে একটি সাম্প্রদায়িক হামলায় সেটেলার বাঙালিরা ২০০ অধিক জুম্মদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে, অভিযোগ রয়েছে সামরিক ও সেনাবাহিনীর মৌন সম্মতিতে এবং প্রকাশ্যে আদিবাসীদের উপর গুলিবর্ষণের কারণে ২ জুম্ম গুলিবিদ্ধ এবং অন্তত ২৫ জন আহত হয়। এ ঘটনার ফলশ্রুতিতে সেটেলার বাঙালিরা খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার আদিবাসীদের ৬১টি বাড়িঘরে হামলা করে। ২০১১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সেটেলার বাঙালিরা রাঙ্গামাটি জেলার গুলশাখালী ও রাঙ্গী পাড়ায় ২৩ টি জুম্ম বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। রাজানগর বিজিবি জোনের সদস্যরা সেখানে উপস্থিত থাকলেও ধ্বংসযজ্ঞ থামাতে কিছুই করেনি। তার একদিন পর সেনাবাহিনী কুদুকছড়িতে অভিযান চালায় এবং আদিবাসীদের মারধর করে। সম্প্রতি ২০১২ সালের ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সেটেলার বাঙালিরা রাঙ্গামাটি শহরে আদিবাসীদের উপর হামলা চালায়। এতে ৮০ জন জুম্ম আহত হয় এবং অনেক বাড়িঘর ভাংচুর ও তছনছ করা হয়। ২০০৯-২০১২ সময়ে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মোট ৮টি সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়।

১৩. সমতলে আদিবাসীদের ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে আদিবাসীদের গ্রামে অ-আদিবাসীদের দ্বারা অন্তত ৪টি সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়েছে। ২০০৯-২০১২ সময়ে ৪ জন নারীসহ ১৭ জন আদিবাসীকে হত্যা করা হয়েছে এবং প্রায় ১০০টি বাড়িঘর ধ্বংস/লুট করা হয়েছে। সেই সাথে ভূমিদস্যুদের দায়ের করা মামলায় ৬ আদিবাসী গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৪. দুর্ভাগ্যবশত এ ধরনের ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্ত করা হয়নি এবং আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের অপরাধীদের কদাপি গ্রেফতার বা অভিযুক্ত করা হয়েছে। খুব কমক্ষেত্রে অনুসন্ধান রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়, এমনকি অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরও অপরাধীদের সাজা দেওয়া হয় না। অভিযোগকারী যদি আদিবাসী এবং অভিযুক্ত অ-আদিবাসী হয় তাহলে পুলিশ প্রায়ই মামলা দায়ের করতে অস্বীকার/ বিলম্ব করে এবং এমনকি অভিযোগকারীদের হয়রানি করে। এজন্য মানুষ কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা বা প্রতিশোধের ভয়ের কারণে মামলা দায়ের করতে অনীহা প্রকাশ করে। এইভাবে দায়মুক্তির সংস্কৃতি বাংলাদেশে বিরাজ করছে।

১৫. সেনাবাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর তদন্ত মানবাধিকার কমিশনের আইনের উর্ধ্বে রেখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ সালের ৯ জুলাই গৃহীত হয়। দেশের আদিবাসীদের অধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষা এবং কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ এবং কমিশনের চেয়ারপারসনের শক্তিশালী ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত সরকারি সমর্থনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঘ. নারী ও শিশুদের অধিকার এবং তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা

সুপারিশ ৮ (নাইজেরিয়া): নারী, মেয়ে, শিশু, প্রতিবন্ধীদের অবস্থাসহ সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নতির জন্য নীতি ও প্রোগ্রামের উন্নয়ন করা যাতে তারা নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সেই সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করতে পারে (নাইজেরিয়া)।

বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া: বাংলাদেশ সুপারিশটি গ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যে কিছু প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে।

১৬. বাংলাদেশ সরকার সিডও, আইসিইআরডি ও সিআরসি অনুস্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল ৩২ অনুযায়ী আইন ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। 'বাংলাদেশের পেনাল কোড ৩৭৬ ধারা অনুযায়ী' ধর্ষণের শাস্তি ১০ বছর থেকে যাবজ্জীবন হতে পারে এবং সেই সাথে জরিমানা হতে পারে ।

১৭. আদিবাসী নারীদের ধর্ষণ ও অন্যান্য সহিংসতা এবং সুবিচার প্রাপ্যতার অভাব ও অপরাধীদের দায়মুক্তি খুবই উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদিবাসী নারীরা সহিংসতার বিরুদ্ধে সুবিচার পেতে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোর মধ্যে পুলিশের অসহযোগিতা যেমন: অভিযোগ দায়েরে অনীহা ও চিহ্নিত অপরাধীদের গ্রেফতার না করা, অভিযোগ দায়ের করার পরও বিভ্রান্তিকর তদন্ত, অপরাধীদের মাধ্যমে ভিকটিমদের ভয় দেখানো ইত্যাদি। ধর্ষণের মামলায় হাসপাতালের ডাক্তারদের ভিকটিমদের শারীরিক পরীক্ষা করতে অস্বীকার বা বিলম্ব করে আলামত নষ্ট করে দেয়ার দৃষ্টান্ত আছে। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুলাই ২০১২ পর্যন্ত সারা দেশে অন্তত ৮৮ জন আদিবাসী নারী যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০ আদিবাসী নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে যেখানে ৩১ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে। ২০১২ সালের জানুয়ারী-জুন মাসে অন্তত ৩৬ আদিবাসী নারী ও মেয়েশিশু (পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ১৬ এবং সমতল থেকে ২০) অ-আদিবাসী ব্যক্তি দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিকটিমদের মধ্যে ৬ জনের বয়স ১৫ বছরের নিচে। উদাহরণস্বরূপ ২৯ অগাস্ট ২০১২ খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার একটি ১১ বছরের ত্রিপুরা শিশু এক পুলিশ কনস্টেবল দ্বারা ধর্ষিত হয়, অপরাধী ব্যক্তি হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একজন সদস্য যার কর্তব্য হচ্ছে এ ধরণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। একটি ধর্ষণ ও হত্যা মামলা ছাড়া এমন কোন উদাহরণ নেই যেখানে আদিবাসী নারীরা সঠিক বিচার পেয়েছে। এই ধরনের অপরাধের দায়মুক্তি অপরাধীদের আরো অপরাধ করার উস্কানি দেয়। উদাহরণস্বরূপ ২০১১ সালের ১৫ জুন পার্বত্য চট্টগ্রামের লংগদু উপজেলার একজন সেটেলার একটি ১৩ বছরের আদিবাসী মেয়েকে ধর্ষণ করে এবং পরে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু কোন শাস্তি ছাড়া জামিনে বের হয়ে আছে। শীঘ্রই মুক্তির পর তিনি আবার একই উপজেলার ১১ বছর বয়সী অন্য এক আদিবাসী মেয়েকে ধর্ষণ এবং হত্যা করে।

১৮. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অধীনে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিচারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি আলাদা আদালত বসানো হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘায়িত বিচারিক প্রক্রিয়া, পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসন এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা, মামলা চালানোর জন্য আর্থিক সীমাবদ্ধতা, বৈষম্যমূলক সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি কারণে আদিবাসী নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করার জন্য বলিষ্ঠ কিছু করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ সালের ৭ মার্চ আদিবাসী নারীদের উন্নয়নের জন্য কিছু বিধান গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও আদিবাসীদেরকে 'অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তবে নীতিমালায় আদিবাসী নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত রাষ্ট্র ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সংক্রান্ত কিছু উল্লেখ করা হয়নি। নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের সময় আদিবাসী নারীদের সাথে কোনরূপ আলোচনা করা হয়নি। তারা সম্মুখীন স্বতন্ত্র সমস্যা বিবেচনা করে তাদের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজনের দাবি করেছে।

বৈষম্য

সুপারিশ ১৭ (ভ্যাটিকান সিটি) সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিষয়ে অভিযোগ তদন্ত করা, সেই সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম বাড়াতে হবে (ভ্যাটিকান সিটি)।

বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া: সরকার জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম বা অন্য কোন অবস্থার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্যকে ক্ষমা করে না। সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা, চাকুরি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি ও সহজতর করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কল্যাণে বিশেষভাবে সচেতন। কোনো বৈষম্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে মোকাবিলা করা হচ্ছে।

২০. ২০১১ সালের ২২ নভেম্বর জেলা প্রশাসকের অফিস তিন পার্বত্য চট্টগ্রামের সব এনজিওকে তাদের প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগী/স্বত্বভোগী এবং কর্মচারীদের জাতিগত তথ্য (**আদিবাসী ও বাঙালির সংখ্যা**) জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কয়েকজন জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তারা আদিবাসী পরিচালিত এনজিওগুলোতে আরো বেশি বাঙালি কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ার জন্য মৌখিকভাবে নির্দেশ দেয়। বেশিরভাগ আদিবাসী সুবিধাভোগী/স্বত্বভোগী এবং কর্মচারীরা অধিকমাত্রাই প্রান্তিক এবং দুর্গম এলাকায় বাস করে বলে এনজিওগুলো তাদের নিয়ে কাজ করে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলো মৌখিক ও লিখিত আকারে জানায়।

২১. আদিবাসী ছাত্রদের জন্য ভর্তি কোটা সংক্রান্ত কোন সুসঙ্গত নীতি নেই এবং সমস্ত বিষয়টি প্রায়শই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় থেমে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সরকারি চাকুরির কোটার ক্ষেত্রে গত ৬টি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (২৪তম-২৯তম) আদিবাসী প্রার্থী নিয়োগ খুব কম ছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় ট্রাইবেল কোটা নীতি গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত নিছক ১-২% ট্রাইবেল কোটা পূর্ণ হয়েছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৭ তম ব্যাচ পর্যন্ত খালি আসনগুলো নন- ট্রাইবেল প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা হত।

২২. কৃষিকাজে নিয়োজিত আদিবাসী নারী শ্রমিকরা বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ এবং চা বাগানের নারী শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত মজুরি বৈষম্যের শিকার হয়। নারী শ্রমিকরা পুরুষের সমপরিমাণ কাজ করে সত্ত্বেও তারা পুরুষের মজুরির অর্ধেক মজুরি পায়। এছাড়াও তারা শ্রমিক হিসাবে অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত সুবিধা পেতে বৈষম্যের শিকার হয়।

২৩. ২০১০ সালের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট আইন আদিবাসীদের সাথে কোনো ধরনের পরামর্শ করে করা হয়নি। এই আইনে ৫৪টির অধিক নৃগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে মাত্র ২৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যার ফলে বাকি জাতিগোষ্ঠী ২০১১ সালের আদমশুমারী এবং সমতলের আদিবাসীদের কল্যাণার্থে গঠিত স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের উন্নয়ন সুবিধায় বাদ পড়ে যায়। স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স ডিভিশনে আদিবাসীদের কোন জোরালো ভূমিকা নেই এবং আদিবাসী প্রতিনিধির সমন্বয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের চাহিদাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

২৪. উচ্চ নিরাপত্তার নামে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশীদের পরিদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কোনো আদিবাসী ব্যক্তি, ধর্মীয় গুরু, গোষ্ঠীর সাথে দেখা করার সময় তাদেরকে জেলা প্রশাসনের একজন প্রতিনিধিকে সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোনো আদিবাসী শিশু ও তাদের পরিবারকে নগদ অনুদানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে। ২০১১ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজের সঙ্গে ৬ষ্ঠ দফার আলোচনা জেলা প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপের ফলে বন্ধ করতে বাধ্য হয়। আগস্ট ২০১১ থেকে জুলাই ২০১২ এর মধ্যে তিন বিদেশী নাগরিককে (একজন ব্রিটিশ, একজন মার্কিন এবং একজন সুইডিশ) বান্দরবান জেলা ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই ধরনের সীমাবদ্ধতা পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উপর হুমকি ও একটি ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে এবং এধরনের পরিস্থিতি মানবাধিকার কর্মীদের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্তকে কঠিন করে তোলে যেটি দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে বাড়াতে সাহায্য করে।

আদিবাসীদের আত্মপরিচয় এবং অখণ্ডতা

২৫. আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে সরকার আত্মপরিচয়ের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির দাবিকে উপেক্ষা করে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে তাদেরকে ট্রাইবেল, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করেছে। তবে, অনেক সরকারি দলিলে তাদেরকে ট্রাইবেল, আদিবাসী অথবা অ্যাবরিজিনাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ

ক. 'অ্যাবরিজিনাল': পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ (বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম তফসিলে সুরক্ষিত)

খ. **'আদিবাসী': পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০; অর্থ আইন ১৯৯৫ এবং ২০১০;** দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশল (২০০৮, ২০০৯-২০১০); ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; বাংলাদেশের প্রত্যাশিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ (২০১০)

বাংলাদেশের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্প্রীতি চাকমা বনাম কাস্টমস ও অন্যান্য কমিশনার (৫ বিএলসি, এডি, ২৯)

গ. 'আদিবাসী': মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া এবং ড. ফখরুদ্দীন আহম্মদের আদিবাসী দিবসের শুভেচ্ছা বার্তায়, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০।

২৬. আদিবাসীদের দাবির মধ্যে সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ শাসন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারের সুরক্ষা, সংসদে ও স্থানীয় সরকার পরিষদে নারীসহ আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, সাংবিধানিক বিধান এবং আদিবাসীদের সাথে সম্পর্কিত আইন তাদের পূর্বানুমতি ছাড়া সংশোধনের সাংবিধানিক গ্যারান্টি, ভূমির অধিকার, তাদের এলাকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও চুক্তির আওতায় আইন প্রণয়ন ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত। তবে বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীতে উপরে উল্লেখিত দাবি নিশ্চিত না করে আদিবাসীদেরকে বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আদিবাসীরা এটিকে প্রত্যাখান করেছে এবং তারা নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী কিন্তু জাতিতে বাঙ্গালি নয় বলে দাবি করছে।

২৭. ১১ মার্চ ২০১২ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে কোন কর্মসূচি পালন না করার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। পুলিশ জয়পুরহাট, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় আদিবাসীদের সমাবেশে বাধা প্রদান করে। ২১ জুলাই ২০১১ অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সামরিক সদর দপ্তর ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সরকার সকল আইন, নীতিমালা, দলিল এবং প্রকাশনা থেকে আদিবাসী শব্দটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বর্তমান ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী শব্দটি পরিবর্তন করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যোগ করা হয়।

ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার

২৮. ২০০৯ থেকে ২০১২ সময়ে আদিবাসীরা অ-আদিবাসী বহিরাগত সেটেলারদের দ্বারা এবং সামরিক ও আধা সামরিক ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বনায়ন, পর্যটন, ইকো পার্কের নামে ক্রমাগতভাবে তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। সরকারের সরাসরি ও মৌন সহযোগিতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় সেইসব ভূমি হস্তান্তর সম্ভব হয়েছে। এসব বাদেও প্রাইভেট কর্পোরেশন এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা আদিবাসীদের ভূমি ও বাগান দখলে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। উপরের উল্লিখিত ভূমি হস্তান্তর জাতীয় ও আঞ্চলিক আইন এবং আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এর পরিপন্থী। যেটি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার অনুস্বাক্ষর করেছে। এই কনভেনশন আদিবাসীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভূমির অধিকারের নিরাপত্তা প্রদান করে। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিছু এলাকা বাদে সমতলের কোন আদিবাসী তাদের জমি অ-আদিবাসীদের কাছে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর করতে পারবে না। এ আইনের ব্যবহার দিনাজপুরে খুব কম হয় এবং রাজশাহীতে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন ও উন্নয়নের নামে সরকার দ্বারা ভূমি দখল করে এই আইনটি লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

২৯. বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমের আদিবাসীরা ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন জমি সরকার কর্তৃক খাস জমি চিহ্নিত করার কারণে হারিয়েছে। সরকার দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়িতে কয়লা খননের উদ্যোগ গ্রহণ করার কারণে সাঁওতাল ও ওরাও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৭৫টি গ্রাম উচ্ছেদের মুখে রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ওখানকার পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। ২০০১ সালে মৌলভীবাজার জেলায় ইকো পার্ক স্থাপনের ফলে ১০০০ অধিক খাসি আদিবাসী পরিবার তাদেও পৈত্রিক ভূমি থেকে উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়। অনুরূপ প্রকল্প গারো অধ্যুষিত এলাকা মধুপুর গ্রহণের ফলে ২০,০০০ গারো উচ্ছেদের হুমকির মধ্যে রয়েছে।

৩০. সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে সমতলের আদিবাসীদের ভূমির মালিকানা, জলভূমি ও বনাঞ্চলের উপর ঐতিহ্যগত অধিকারের সাথে ভূমি কমিশন গঠনের কথা থাকলেও সরকার এখনও পর্যন্ত ভূমি কমিশন গঠন করেনি।

৩১. বহিরাগত ভূমিদস্যুরা বান্দরবানের বিভিন্ন উপজেলায় শত শত স্থানীয় জুম্ম এবং স্থায়ী বাঙালি বাসিন্দাদের উচ্ছেদের জন্য ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি প্রদান করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর পদমর্যাদার সেনা কর্মকর্তা বান্দরবানের ফাইতং মৌজার শত শত একর জমি দখল করে। ফাসিয়াখালী ইউনিয়নের আমতলী পাড়ার আদিবাসী ম্রো সম্প্রদায়ের ১৩টি পরিবার ভূমিদস্যুদের হুমকি ও অত্যাচারের কারণে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ নামে একটি প্রতিষ্ঠান যৌথ মালিকানাধীন জুমচাষের জমিসহ প্রায় এক হাজার একর জমি অবৈধভাবে দখল করে। প্রাক্তন সেনাকর্মকর্তার অন্য একটি প্রতিষ্ঠান বান্দরবান জেলার লেলুং মৌজায় ২,০০০ একরের অধিক জমি দখল করে। রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য ৯৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ করার কারণে ১৫,০০০ ম্রো আদিবাসী তাদের পৈতৃক ভূমি থেকে উচ্ছেদের আশংকার মধ্যে রয়েছে।

৩২. আদিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রায়ই বন আইন লঙ্ঘনের জন্য মিথ্যা এবং হয়রানি মুলক ফৌজদারি মামলার অভিযোগ আনা হয়। বনের উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের জন্য ঘোষণা চাষ প্রথাগত চাষাবাদ, শিকার, খাদ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য অধিকারের অস্বীকৃতি আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এবং সিবিডির বিধান (উভয়ই অনুস্বাক্ষরিত) লঙ্ঘন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ সরকারের সামাজিক বনায়ন, ইকো পার্ক, রাবার বাগান এবং ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

ধর্মীয় নিপীড়ন

৩৩. সংবিধানের ২ (ক) ধারায় ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য ধর্মের অনুশীলনে এটি সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা প্রদান করে. সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আদিবাসীদের উপর ধর্মীয় নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। বৌদ্ধ মন্দির দখলের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্যাতন, বুদ্ধ মূর্তি ভেঙ্গে দেওয়া, বৌদ্ধ মন্দির সংস্কার এবং নির্মানে বাধা দেওয়া ইত্যাদি অন্যতম। উদাহারণস্বরূপ মন্দিরের জায়গা দখলের উদ্দেশ্যে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের ২০০ বছরের পুরানো বৌদ্ধ মন্দির ভূমিদস্যুদের দ্বারা বেশ কয়েকবার ধ্বংস ও লুটপাট করা হয়। গত ২৯ জুলাই ২০১১ বনবিভাগের কর্মীরা বান্দরবান জেলার আলীকদমে আদিবাসীদের একটি উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়। ২৮ জানুয়ারি ২০১২ বাঙালি সেটেলাররা রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার হরিনাছড়া বিল নামক জায়গায় বৌদ্ধদের একটি ভাবনা কেন্দ্রে লুটপাট চালায়। কক্সবাজার জেলায় গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর উগ্র মৌলবাদীরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ১৯টি মন্দির এবং ৪০টি বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে এবং ২০০ অধিক বাড়িতে লুটপাট ও ভাংচুর চালায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর আপত্তির কারণে রাঙ্গামাটি জেলার সাপছড়ি ইউনিয়নের ফুরোমোন আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্রের জমিটি বন্দোবস্তি করা যায়নি।

পেশা, জীবিকা এবং খাদ্য নিরাপত্তা

৩৪. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণে বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের জায়গায় বসানোর ফলে সেখানকার জমির উপর চাপ বেড়েছে। যার ফলে আদিবাসীরা জমি হারাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ধর্ষণ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে যেটি আদিবাসীদের জীবিকা ও পেশা যেমন জুমচাষ, পশুপালন, গোচারণ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করছে। চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের আর্টিকেল ৪৯ এ এই ধরনের জনসংখ্যার ট্রান্সফার নিষিদ্ধ করা আছে। বহিরাগত সেটেলাররা অন্যায়ভাবে আদিবাসীদের জমি জবরদখলের কারণে তাদের জীবিকা হুমকির মধ্যে পড়েছে।

৩৫. আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সরকারের বৈষম্যমূলক মনোভাব আদিবাসীদের কৃষি ও জীবিকা পদ্ধতির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, জুম চাষ চাষাবাদের একটি আদিম এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে শিকার করা, ফাঁদপাতা, খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি একই দৃষ্টিতে দেখা হয় যা তাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা পদ্ধতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সর্ম্পযুক্ত। যেগুলো আইসিসিপিআর (ইএসপি আর্টিকেল ২৭), আইসিইআরডি, আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ ও ১১১ এবং জীব বৈচিত্র্যের কনভেনশনের পাশাপাশি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন কমিশনের সাথে বিরোধাত্মক।

৩৬. আদিবাসীদের খাদ্যের অধিকার তখনই লঙ্ঘিত হয় যখন ভূমি, অঞ্চল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। ক্রমাগত প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস ও তাদের ভূমি গ্রাসের কারণে আদিবাসীরা দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। আদিবাসীদের ভূমি এবং তাদের সম্পদ রক্ষা করা তাদের খাদ্যের অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। দুর্ভাগ্যবশত এই অপরিহার্য সুরক্ষার জন্য আইনি গ্যারান্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং সমতলে সরকারি পর্যায়ে এটি কম্পাইল করা হয়না। উদাহরণস্বরূপ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালের ৩০ জুন ৪,০০০ গাছ কাটার অনুমতি দেয়ার ফলে শ্রীমঙ্গলের আসলম পুঞ্জি (নাহার ১) এবং কলিন পুঞ্জির (নাহার ২) প্রায় ৬০ আদিবাসী খাসী পরিবার তাদের পৈত্রিক ভূমি থেকে উচ্ছেদের শিকার হবে এবং এতে তাদের প্রথাগত জীবিকা এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। খাসি গ্রামবাসীরা ঐতিহ্যগতভাবে পান চাষের উপর নির্ভরশীল। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক প্রতিষ্ঠার কারণে আদিবাসী বর্মন সম্প্রদায়ের আট গ্রামসহ প্রায় ৭,০০০ পরিবার উচ্ছেদের ভয়ে আছে।

সুপারিশসমূহ

৩৭. উপরের বাস্তবতার আলোকে নিচের বিষয়গুলো বাংলাদেশ সরকারের কাছে সুপারিশ করা যেতে পারে:

১) আদিবাসীদের আত্মপরিচয় আদিবাসী হিসেবে, অখণ্ডতাকে এবং মৌলিক অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান।

২) বর্তমান সরকারের মেয়াদেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ এর পরিপূর্ণ, যথাযথ এবং দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে রুপরেখা ঘোষণা এবং ব্যক্তি ও সংস্থার দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা।

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শ করে রুলস অব বিজনেস সহ পরিষদকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করা।

খ) তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান ও বিভাগগুলো হস্তান্তর করা।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শ করে সংশোধন করা। একজন নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও যোগ্য ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল প্রকার অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যহার এবং অপারেশন উত্তরণ নামক কার্যত সামরিক শাসন বন্ধ করা।

ঙ) ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তচ্যুতদের পুনর্বাসন করা।

চ) রাবার এবং অন্যান্য বনায়নের জন্য বহিরাগত ব্যক্তি এবং কোম্পানীকে দেওয়া ইজারাগুলো বাতিল করা।

ছ) পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি বেসরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে জুম্মদের অগ্রাধিকার দিয়ে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ দেওয়া।

জ) সাংবিধানিক সুরক্ষাসহ অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা।

৩. নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্তের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করা এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে এসে অপরাধীদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসা।

৪. সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য আলাদা ভূমি কমিশন গঠন করা এবং গত ৪০ বছরে বেহাত হয়ে যাওয়া জমিগুলো পুনরুদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।

৫. আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এর সকল ধারা এবং সে অনুসারে দেশের আদিবাসীদের সংশ্লিষ্ট সকল জাতীয় আইন সংশোধন ও পরিমার্জন করে কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা।

৬. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা জোরদার করা এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতার বিধান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।

৭. সরকারকে দ্রুত আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র অনুমোদন এবং আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করা।

৮. স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের উপদেষ্টা কমিটি গঠন ও সংশোধন এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা।

৯. আদিবাসী বিষয়ক কমিশন গঠনের জন্য আদিবাসী অধিকার আইন পাস করা এবং সংসদে ও স্থানীয় কাউন্সিলে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০. জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক বিশেষ রেপোটিয়ারকে অনুরোধ সাপেক্ষে বাংলাদেশ পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া।

সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি (ইউপিআর) সম্পর্কিত ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সমর্থিত আদিবাসী বিষয়ক সুপারিশসমূহ

ভূমিকা :

১. ১৮ জুন, ২০০৭ মানবাধিকার কাউন্সিল প্রেজুল্যুশন ৫/১ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন পরীবিক্ষণ পদ্ধতির কার্যনির্বাহী গ্রুপের ষোড়শ অধিবেশন ২৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৩ সালের ২৯ এপ্রিল ১১তম সভায় বাংলাদেশের উপর পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা: দিপু মনি। ২ মে ২০১৩ অনুষ্ঠিত ১৭তম সভায় বাংলাদেশের প্রতিবেদন কার্যনির্বাহী গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত হয়।

২. ১৪ জানুয়ারি ২০১৩ মানবাধিকার কাউন্সিল বাংলাদেশ এর পর্যালোচনা সহজতর করার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিনিধি গ্রুপ নির্বাচন করে (চেক প্রজাতন্ত্র, ইথিওপিয়া ও পাকিস্তান)।

৩. রেজুল্যশনের ১৫ অনুচ্ছেদ এর পরিশিষ্ট ৫/১ এবং ৫ অনুচ্ছেদ এর পরিশিষ্ট ১৬/২১ অনুযায়ী নিম্নোক্ত দলিল বাংলাদেশের পর্যালোচনার জন্য জারি করা হয়েছে।

ক) ১৫(a) (A/HRC/WG.6/16/BGD/1) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি জাতীয় রিপোর্ট জমা/লিখিত উপস্থাপনা করা;

খ) ১৫(b) (A/HRC/WG.6/16/BGD/2) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী OHCHR এর একটি সংকলন প্রস্তুত করা;

গ) ১৫(c) (A/HRC/WG.6/16/BGD/3) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী OHCHR এর একটি সারাংশ প্রস্তুত করা।

৪. চেক প্রজাতন্ত্র, জার্মানী, আয়ারল্যান্ড, লিচটেন্সটেইন, মেক্সিকো, মণ্টিনেগ্রো, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, স্লোভেনিয়া, স্পেন, যুক্তরাজ্য দ্বারা আগাম প্রস্তুতকৃত প্রশ্নগুলির একটি তালিকা Troika (চেক প্রজাতন্ত্র, ইথিওপিয়া ও পাকিস্তান)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়। এই প্রশ্নগুলো ইউপিআর-এর এক্সট্রানেট এ পাওয়া যায়।

ক. বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক পর্যালোচনা

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা: দীপু মণি এমপি বাংলাদেশে ভবন ধ্বসের ফলে যে প্রাণহানী হয়েছে তার প্রতি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন।

৬। তিনি বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার বিগত চার বছরে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল যাতে দেশের সকল নাগরিক সংবিধানে প্রদত্ত মানবাধিকার ভোগ করতে পারে। তিনি সকলের সামনে বাংলাদেশের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালার কথা তুলে ধরেন যেখানে দেশের সকল নাগরিকের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত

করার কথা বলা হয়েছে। তিনি জাতীয় নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় সে উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে কার্যকরী ও স্বাধীন করার পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, বিগত চার বছরে জাতীয় সংসদে ১৯৬টি আইন পাস করা হয়েছে যেগুলি কোন না কোনভাবে মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত। তিনি স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলি দ্বিপক্ষীয় পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে তাদের কাজের নিশ্চয়তা বজায় রেখেছে বলে তথ্য প্রদান করেন। বিচার বিভাগ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন যাতে স্বাধীন ও কার্যকরীভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি নিশ্চিত করেন।

৭। পররাষ্ট্রমন্ত্রী দৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, তার সরকার কোন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বরদাস্ত করবে না এবং এরূপ ঘটনায় জড়িত অপরাধীকে অব্যাহতি দেবে না। তিনি আরও বলেন, অপরাধী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকদের মধ্যে কোন ধরনের গুলি বিনিময়ের ঘটনায় দুর্ঘটনাবশত কারো মৃত্যু হলে দেশে প্রচলিত বিচারিক আইন অনুযায়ী তদন্ত করা হয়। তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির নাম ব্যবহার করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অপহরণের ঘটনাবৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে উল্লেখ করেন যে এ ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত প্রায় ৫৪০ জন অপরাধীকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিনা বিচারে অপরাধীকে রেহাই দেওয়ার সংস্কৃতি বন্ধ করার ক্ষেত্রে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ইতিমধ্যে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্বঘোষিত হত্যাকারীদের বিচার করার কথা বলেন এবং 'রোম স্টাটিউট' নীতিমালা অনুযায়ী দেশে নিজস্ব আদালতে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যায় জড়িতদের বিচার করার কথা ব্যক্ত করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, তার সরকার একটি ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর যেমন– বিগত বছরে রামুতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ এবং সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সহিংসতা কিংবা এ ধরনের কোন ভীতি প্রদর্শন বা আক্রমণে উৎসাহ প্রদান করেনা। তিনি সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের উপজাতি এবং নৃ-গোষ্ঠীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেন।

৮। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর অধীনে নারীদের ক্ষমতায়ন এবং পারিবারিক নির্যাতন ও নিপীড়ন, নারী পাচার প্রতিরোধ, অশ্লীল চিত্র/পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ এবং নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে কঠোর হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি শিশু এবং নবজাতকদের মৃত্যুহার হ্রাস, পুষ্টিহীনতা প্রতিরোধ করা সহ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম বন্ধ করার বিষয়ে সরকারের সফলতার কথা তুলে ধরেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় শ্রমনীতি এবং সাম্প্রতিককালে ২০০৬ সালের শ্রম আইনের অধীনে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও যৌথ দরকষাকষির ক্ষমতা প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি Expatriate welfare act ২০১৩ বা বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণমূলক আইন ২০১৩ এর মাধ্যমে প্রবাসী শ্রমিকদের মানবাধিকার রক্ষা ও কল্যাণ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০১৩ সালে প্রণীত আইনের অধীনে সমাজে প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠী যেমন- শরণার্থী, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষনের নিমিত্তে গ্রহীত পদক্ষেপগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

৯। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনগণের পূর্ণ মানবাধিকার অর্জনের পথে দারিদ্র্যতার প্রভাব এবং মানবাধিকার ভোগের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হিসাবে উন্নয়নের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন। তিনি বিগত চার বছরে ১০% দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যসেবার উন্নতি, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির কথা উল্লেখ করেন। মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণদেশ হিসেবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। একারণে তিনি ২০১২ সালে ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে মানবাধিকার এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ন্যায়বিচার

বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপনে ভূমিকা রাখেন। তিনি সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি সুশীল সমাজ ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মন্ত্রী বলেন তার সরকার মানবাধিকার শিক্ষা উন্নয়ন এবং সমাজে মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির সংস্কৃতি চালু করার জন্য কাজ চালিয়ে যাবে। পরিশেষে তিনি বলেন যে, রিভিউ পিরিয়ডের সময় তার সরকার পরিবর্তনের ভিত্তিস্থাপন করেছে; যা বাংলাদেশেকে উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করে তুলবে।

খ. আন্তঃসংলাপ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক পর্যালোচনা

১০) আন্তঃআলোচনায় ৯৭জন প্রতিনিধি বক্তব্য উত্থাপন করেন; তন্মধ্যে ৯৪জন প্রতিনিধি সুপারিশ প্রদান করেছিলেন। আলোচনা সভায় যে সমস্ত সুপারিশ তৈরি করা হয়েছিল বর্তমান প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তা পাওয়া যাবে।

১১) বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশে ভবন ভেঙ্গে (রানা প্লাজা) যাওয়ার ফলে যে সমস্ত লোক হতাহত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে গভীর শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং মন্ত্রী তাদের প্রতি (প্রতিনিধিদের) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১২) মন্টিনিগ্রো ১৬ বছর থেকে ১৮ বছরের ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার (সিআরসি) সম্পর্কিত সুপারিশ বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিনা সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

১৩) মরক্কো বক্তব্য উত্থাপন করে বলে যে, বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে ভালো ফলাফল করেছে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা এবং মানবাধিকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে।

১৪) নেপাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করে বলে, দারিদ্র্য বিমোচনে এবং জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন সহ স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অনেক অগ্রগতি করেছে।

১৫) নেদারল্যান্ড নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধীদের রেহাই দেওয়া, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, প্রশংসতা অব্যাহত থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে।

১৬) নিকারাগুয়া 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নে নতুন আইন গ্রহণের বিষয় তুলে ধরে যার লক্ষ্য জাতীয় নীতিমালার সাথে মানবাধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা।

১৭) নাইজেরিয়া বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষা এবং অগ্রগতিতে চেষ্টা ও প্রতিবেদনের জন্য প্রশংসা করে।

১৮) নরওয়ে বিগত বছরে বেশ কিছুসংখ্যক সাংবাদিককে বন্দী ও হত্যাকাণ্ডের বিষয় উল্লেখ করে। তারা বলে, যেসব তরুণ ব্লগার খোলামেলাভাবে ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করে তারা হুমকি বা মৃত্যুভয়ের শিকার হয়।

১৯) ওমান উল্লেখ করে যে, সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং মানবাধিকার পদ্ধতি চুক্তি অনুমোদন করেছে।

২০) পাকিস্তান ১৯৬ সংসদীয় আইন প্রণয়ন সহ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, পারিবারিক সহিংসতা আইন এবং মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক আইনকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে চেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রশংসা করে এবং আশাবাদ ব্যক্ত করে বলে যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালীকরণে বাংলাদেশ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

২১) পেরু বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি, দারিদ্র্য বিমোচন, শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু বিষয়ে অগ্রগতি এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক সমতার কথা তুলে ধরে।

২২) ফিলিপাইন বাংলাদেশের প্রবাসীদের কল্যাণার্থে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও তাদের অধিকার সুরক্ষায় নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিশেষ প্রশংসা করে। প্রবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য তারা বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করাকে গুরুত্ব দেয়।

২৩) পর্তুগাল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ সমতার অগ্রগতিসহ জাতিসংঘের উন্নয়ন কার্যক্রমকে সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশকে স্বাগত জানায়। এছাড়া দেশটি বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি বন্ধ করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আইন জারি করাকে প্রশংসা করে। তারা আরো মতামত ব্যক্ত করে বলে যে, পরিবারে এবং অন্যান্য স্থানেও শারীরিক শাস্তি প্রয়োগে বিধি নিষেধ করার আইন সংশোধন করা উচিত।

২৪) কাতার সরকারের আইন বিভাগ ও রাজনৈতিক সংস্কার এবং শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে গ্রহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করে। তারা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচার করার ক্ষেত্রে যে বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় তারও প্রশংসা করে।

২৫) কোরিয়া মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত ১৯৬টি সংসদীয় বিধান পাস করার জন্য স্বাগত জানায়। তাছাড়া, নারী ও বালিকাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, পারিবারিক সহিংসতা, জোরপূর্বক বিবাহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে।

২৬) মালদোভা প্রজাতন্ত্র ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা, নারী ও কিশোরীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে স্বীকৃতি দেয়।

২৭) রুমানিয়া আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠনে রোম স্টাটিউট বা লিখিত আইন অনুমোদন এবং শিশুশ্রম ও গৃহকর্মীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে নীতিমালা গ্রহণের ফলে ইতিবাচক প্রভাবের প্রশংসা করে।

২৮) রাশিয়া ফেডারেশন বাংলাদেশের মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার সফলতায় প্রশংসা করে। একইভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোর শর্ত পালনে সহযোগিতারও প্রশংসা করে।

২৯) রুয়ান্ডা মানবাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটা প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য স্বাগত জানায়। তারা আরো উল্লেখ করে যে, দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জনসাধারণের আস্থা লাভ করেছে।

৩০) সৌদি আরব সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার উন্নয়নে কিছু সফলতা লক্ষ্য করা গেছে বলে উল্লেখ করে। তারা উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে দরিদ্র ও অসহায়দের কথা নির্দিষ্ট করে বলার জন্য প্রশংসা করে।

৩১) সেনেগাল একটা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের উপর জোর দেয় যেখানে মানবাধিকার জোরালো করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি পদ্ধতি দৃঢ় করা সম্ভবপর হবে।

৩২) সিয়েরালিওন ১৯৬টি সংসদীয় আইন পাসের বিষয়ে অবহিত করে, যার মাধ্যমে জনগণের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি তুলে ধরা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশন গঠন, বিভিন্ন কমিশন গঠন, বিভিন্ন কনভেনশন অনুমোদন এবং এর বাড়তি গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩৩) সিঙ্গাপুর মানবাধিকার লঙ্ঘনে সেনাবাহিনী ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থায় নিয়োজিত লোকদের শাস্তিপ্রয়োগ না করে ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা রোধে ব্যবহারিক কার্যবিধি প্রণয়ন বিষয়ে উল্লেখ করে।

৩৪) স্লোভাকিয়া বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষায় অগ্রগতি ক্ষেত্রে চেষ্টার বিষয়ে অবহিত হয়। প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষা কনভেনশন (সিআরপিডি), আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) রোম স্টাটিউট বা আইন অনুমোদন দেওয়ার জন্য প্রশংসা করে।

৩৫) স্লোভানিয়া বাংলাদেশের নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা এবং রোম স্টাটিউট অনুমোদন করার জন্য প্রশংসা করে। উল্লেখ্য যে, দলিত জনগোষ্ঠীরা সব ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়।

৩৬) সোমালিয়া বাংলাদেশকে তার অর্জনের জন্য অভিনন্দিত করে।

৩৭) দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষার অধিকারকে গুরুত্ব ও উন্নতি এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য বা স্যানিটেশন অর্জনে জাতীয় সেনিটেশন পদ্ধতির প্রশংসা করে। তারা পুলিশ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার বিভাগের সংস্কার ও প্রশিক্ষণেরও প্রশংসা করে।

৩৮) স্পেন নীল দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে ২০০৯ সাল থেকে যে সংস্কার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে পানি ও স্বাস্থ্য (স্যানিটেশন) অধিকার ক্ষেত্রে তার অঙ্গীকারের জন্য প্রশংসা করে।

৩৯) শ্রীলঙ্কা মানবাধিকার বিষয়ে বিশেষভাবে (ক) ১৯৬টি সংসদীয় আইন গ্রহণ; (খ) অর্থ পাচার, মানব পাচার ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ; (গ) অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ইতিবাচক ফল এবং; (ঘ) স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস বিষয়েঅগ্রগতির জন্য বাংলাদেশকে প্রশংসা করে।

৪০) প্যালাস্টাইন রোম স্টাটিউট গ্রহণ এবং সকল প্রবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা অধিকার ও কমিটি (সিএমডব্লিউ) গঠনের জন্য বাংলাদেশকে স্বাগত জানায়। তারা পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০, ২০১২ সালের মানব পাচার আইন এবং ২০১১ সালের শিশু উন্নয়নে জাতীয় নীতি এবং শিক্ষা নীতি গ্রহণের জন্য প্রশংসা করে।

৪১) সুদান মানবাধিকার উন্নয়ন এবং বিশেষভাবে বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার বিভাজন এবং নারীদের ক্ষমতায়ন ও শিশুশ্রম নির্মূলের নীতি গ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে স্বাগত জানায়।

৪২) সুইডেন নারী ও শিশুদের অবস্থা উন্নতির জন্য বাংলাদেশকে জোরালো আহ্বান জানায়। তারা নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে। তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শনের সময় শক্তি প্রয়োগ থেকে সংযত হওয়ার জন্য বাংলাদেশকে উৎসাহ দেয়।

৪৩) সুইজারল্যান্ড বলপ্রয়োগে বেশ কয়েক ব্যক্তির হারিয়ে যাওয়া এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে সংখ্যালঘুদের অবস্থা সর্ম্পকে উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা যে কোন অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে।

৪৪) প্রান্তিক এবং অসহায় জনগোষ্ঠীদের মানবাধিকার রক্ষায় থাইল্যান্ড বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু তারা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অসহিষ্ণুতা নিরসনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আহ্বান করে। থাইল্যান্ড নারী ও শিশুস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতির কথা উল্লেখ করে। এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রক্রিয়ার সাথে সহযোগিতার দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করে প্রশংসা করে।

৪৫) তিউনেশিয়া প্যারিস Principle বা বিধিবিধান অনুসারে বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার উৎসাহ প্রদান করে।

৪৬) তুরস্ক আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, আইনের শাসন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বিষয়ের কথা স্বীকার করে। তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন, মানবাধিকার সুরক্ষা আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং মানব পাচার ও সন্ত্রাস মোকাবিলা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পদ্ধতি অবলম্বনে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশকে স্বাগত জানায়।

৪৭) তুর্কমেনিস্তান মানবাধিকার সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন, শক্তিশালীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও বিশেষ কৌশল অবলম্বনে বাংলাদেশের চেষ্টা অব্যাহত রাখাকে স্বাগত জানায়। তারা আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার সাথে জাতীয় আইনের সামঞ্জস্য আনয়নের চেষ্টাকে প্রশংসা করে।

৪৮) ইউক্রেন মানবাধিকার সুরক্ষা, শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে বিশেষভাবে নারী অধিকার উন্নয়ন এবং জনগণ সম্পর্কিত দৈনন্দিন কাজের সাথে তাদের জড়িত হওয়ায় বাংলাদেশকে প্রশংসা করে।

৪৯) সংযুক্ত আরব আমিরাত দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সেনিটেশন, পানীয় জল, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রশংসা করে। দূরবর্তী এলাকার সাথে সরকার ইলেকট্রনিক প্রশাসনিক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় প্রশংসা করে।

৫০) যুক্তরাজ্যে এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড উল্লেখ করে যে, নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের আরও অধিক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হতো। এটা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক আইন মানদণ্ড বজায় রাখা এবং রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য বাংলাদেশকে আহ্বান জানায়। তারা বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার সময় দমনমূলক অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়।

৫১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণে উন্নয়ন প্রশংসা করে এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন গোষ্ঠীর যেমন সমকামী পুরুষ, সমকামী নারী, বাইসেক্সুয়াল এবং হিজড়াদের সকল প্রকার বৈষম্য থেকে রক্ষার স্বীকৃতিকে প্রশংসা করেছে।

তারা বাংলাদেশের শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং অধিকার রক্ষার ইচ্ছাকে প্রশংসা করে, একইসাথে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে আহ্বান জানায়। তারা রাজনৈতিক সহিংসতা এবং নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর সদস্যদের দায়মুক্তি দেয়ার সাংস্কৃতিক প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে।

৫২) উরুগুয়ে রোম স্টাটিউট, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত স্থাপন, দুর্নীতি দমন কৌশলের প্রতিরোধ এবং মানব পাচার প্রতিরোধে জাতীয় কর্মসূচি পরিকল্পনা বিষয়ে অনুসমর্থনের প্রশংসা করে।

৫৩) উজবেকিস্তান মৌলিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, এবং মানবাধিকার রক্ষায় আইনি সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক কৌশলে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করে।

৫৪) বলিভিয়া ও ভেনেজুয়েলা প্রজাতন্ত্র উল্লেখ করে যে বিগত ৪ বছরে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ৮.৫ শতাংশ দারিদ্র্য হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। তারা মানব পাচার রোধে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর আলোকপাত করে।

৫৫) ভিয়েতনাম বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও গণতন্ত্র রক্ষা, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা, দারিদ্র্য হ্রাস, স্বাস্থ্যসেবা, সমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জনকে প্রশংসা করে।

৫৬) ইয়েমেন বাংলাদেশকে মানবাধিকার উন্নয়ন যেমন– নাগরিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার ও বিশেষভাবে নারী, শিশু এবং নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালংঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য অভিনন্দন জানায়। জাতীয় নীতিমালায় আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হওয়ায় তারা বাংলাদেশের প্রশংসা করে।

৫৭) জিম্বাবুয়ে আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে বাংলাদেশের প্রশংসা করে– ক) মানবাধিকার রক্ষায় সরকারের প্রচেষ্টা; খ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় আইন প্রণয়ন; গ) শিক্ষানীতি, শিশু শ্রম উচ্ছেদ, শিশু ও নারী অধিকার এবং ন্যায় বিচার পাবার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫৮) আফগানিস্তান নতুন স্বাধীন কমিশন গঠন, আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসমর্থন এবং জনগণের নাগরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার বৃদ্ধির জন্য নতুন আইন প্রণয়নের উপর আলোকপাত করে। তারা বাংলাদেশকে প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা, মত প্রকাশ এবং সভা

আয়োজনের স্বাধীনতা, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সুরক্ষিত নয় এমন গ্রুপ বা দলগুলিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করে।

৫৯) আলজেরিয়া তথ্য অধিকার আইন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইন প্রর্বতন করার বিষয় তুলে ধরে। এছাড়া আলজেরিয়া সুশাসন শক্তিশালীকরণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ জানার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

৬০) আর্জেন্টিনা রোম স্টাটিউট অনুমোদন এবং জাতীয় আইনসেবা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানায়।

৬১) পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন রাষ্ট্রকর্তৃক তার সরকারের উন্নয়নের মডেল এবং বিভিন্ন অর্জনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, একই সঙ্গে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধতার বিষয় স্বীকার করেন।

৬২) মন্ত্রী ১৮ বছরের চেয়ে কম বয়সের শিশুদের মৃত্যুদণ্ডের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। জাতীয় শিশু নীতিমালার খসড়ায় অপরাধী বিবেচনার সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ড শাস্তিবিধান বাংলাদেশে নতুন নয়। শুধুমাত্র ভয়াবহ এবং জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আইন প্রক্রিয়া ও বিচারের মাধ্যমে এই দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬৩) মন্ত্রী বলেন যে, প্যানাল কোড অনুযায়ী বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইনি অনুমোদন নেই। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো শুধু মাত্র আত্মরক্ষা এবং জনগণের জানমালের রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। তিনি বলেন তারা শুধু মাত্র শেষ অবলম্বন হিসাবে শক্তি প্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

তিনি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে ২০০৯-২০১২ সালে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা অনেকখানি হ্রাস পেয়ে ১৭৭ জন এসে দাঁড়ায়। অথচ পূর্ববর্তী ৫ বছরে সে সংখ্যা ছিল ৫৪৬ জন এবং এ ধরনের মৃত্যুর সংখ্যা সর্বমোট বন্দীদের শতকরা হিসাবে শুধুমাত্র ০.৩৪ শতাংশ।

৬৪) মন্ত্রী বলেন যে, দেশে যেকোন আইনের অধীনে বা কোড অব কনডাক্ট অনুসারেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের অপরাধের জন্য অব্যাহতির কোন সুযোগ নেই। যেকোন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বা আগ্নেয়াস্ত্র অপব্যবহারের ক্ষেত্রে তদন্ত করা হয় এবং আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, এই পর্যন্ত ১৬৭৮ জন র‍্যাব সদস্যকে বিভিন্ন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং বিচারের মাধ্যমে জেল ও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

৬৫) মন্ত্রী বলেন, দুর্ব্যবহার ও নিপীড়নের অভিযোগ থাকলে তা সাক্ষী সহকারে প্রমাণ করা প্রয়োজন। ১৯৯২ সালে বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন আইন কারাগারে কয়েদীদের নিপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য কয়েকটা রক্ষাকবচের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি নিপীড়নের কোনঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। তিনি পুলিশ বিভাগকে সাংগঠনিক সংস্কারের মাধ্যমে যাতে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে নিপীড়ন ও দুর্নীতি হ্রাস করা সম্ভব হয় সেজন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করেন।

৬৬) মন্ত্রী বলেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শক্তি প্রয়োগ করে প্রায়ই গুমের ঘটনা ঘটায় এ তথ্য সত্য নয়। তিনি বলেন, গুমকে সমর্থন করে এমন কোন আইনের অস্তিত্বই বাংলাদেশে নেই; বরং অপহরণ বা বলপ্রয়োগ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তিনি আরও বলেন, জনগণের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টির জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের নামে এ ধরনের গর্হিত কাজ করানো হয়।

৬৭) মন্ত্রী বলেন, সরকার সেসব বিধিমালাগুলো বাতিল করেছে যা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে। তিনি বলেন, মানহানির অপরাধে কাউকে গ্রেফতারের বিধানটিও ফৌজদারী আইন থেকে

তুলে নেওয়া হয়েছে। সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে যে, সাংবাদিকদের উপর যে কোন সহিংস আচরণ যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে বিচার করা হবে।

৬৮) মন্ত্রী বলেন, সরকারের আদর্শ হল ধর্ম যার যার, কিন্তু রাষ্ট্র সকলের। এরপর তিনি রামু সীমা বিহারের ভদন্ত মহাথেরোকে দেশের শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

৬৯) মন্ত্রী উল্লেখ করেন, তৈরি পোশাক শিল্প খাতের জন্য সরকার একটা জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতিমালা তৈরির কাজ শুরু করেছে। এলক্ষ্যে একটি ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করা হয়েছে যা উন্নত কাজের পরিবেশ তৈরি নীতি বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

৭০) তিনি বলেন, বাংলাদেশ স্পেশাল প্রসিডিউর মেকানিজমের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রেখে এ বছরের শেষে তিনজন নির্ধারিত ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য সময় নির্ধারণ করেছিল। দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের আইনের সাথে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতির সমন্বয় থাকা দরকার। সরকার কোনভাবেই কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্যকে ছাড় দেবে না।

৭১) পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জাতীয় শিশু আইন ২০১২(খসড়া)-কে সিআরসি বা শিশু অধিকার কনভেনশনের সাথে একীভূত করা দরকার।

৭২) মন্ত্রী নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার অর্জন, নারীবান্ধব শ্রম আইন প্রণয়ন ও মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান বিষয়ে ব্যাখা প্রদান করেন। তিনি নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে ৬টি নতুন আইন প্রণয়ন, যৌন হয়রানি এবং এসিড সংক্রান্ত সহিংসতা প্রতিরোধে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

৭৩) অস্ট্রেলিয়া সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা সরকারকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় মানবাধিকার সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার আহবান জানায়।

৭৪) অস্ট্রিয়া ২০১০ সালে রোম স্টাটিউট অনুসমর্থন এবং ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন অগ্রাধিকার নীতিমালা গ্রহণের জন্য প্রশংসা করে। তারা কিশোর আদালত স্থাপনের জন্য বাংলাদেশকে স্বাগত জানায়।

৭৫) আজারবাইজান বাংলাদেশকে প্রবাসী শ্রমিক এবং তাদের পরিবারগুলির অধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক কনভেনশন (ICRMW) এবং United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes এ যোগদান করার জন্য প্রশংসা করে।

৭৬) বেলারুশ মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ প্রক্রিয়ার সাথে পারস্পরিক আন্তঃসংলাপের উপর জোর দিয়েছে। তারা সরকারের মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংগীকারকে স্বাগত জানিয়েছে।

৭৭) বাহরাইন মানব পাচার রোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাসহ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রম আইন গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশকে প্রশংসা করে।

৭৮) বেনিন জানায়, মানবাধিকার এবং নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন আইন গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ব্যাপারে তারা অবগত আছেন। তারা দুর্নীতি থেকে অব্যাহতি প্রদান, অর্থ পাচার ও মৃত্যুদণ্ড বিলোপ ইত্যাদি বিষয়ে চলমান সক্রিয় ভূমিকার জন্য বাংলাদেশকে উৎসাহ প্রদান করে।

৭৯) ভুটান জানায়, সবচেয়ে প্রান্তিকগোষ্ঠী যেমন নারী, শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ও উল্লেখযোগ্য কিছু আইন ও কাঠামো তৈরির ব্যাপারে তারা অবগত আছে।

৮০) বলিভিয়া শিশু শ্রম বন্ধ, শিক্ষা, নারী উন্নয়ন এবং সারা দেশে আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ তৈরির নতুন নীতিমালা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশকে প্রশংসা করে।

৮১) বতসোয়ানা অনেক চ্যালেঞ্জ ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশে যে মানবাধিকার সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে তা সকলের সম্মুখে তুলে ধরেছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করে।

৮২) ব্রাজিল বাংলাদেশকে দারিদ্র্য বিমোচন নীতি বাস্তবায়ন বজায় রাখার জন্য উৎসাহ দান করে। তারা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় লৈঙ্গিক সমতার সাথে নিবন্ধনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে প্রশংসা করে। ব্রাজিল বলে তারা জাতীয় শিশু আইন গ্রহণের ব্যাপারে অবগত আছেন।

৮৩) ব্রুনাই দারুস সালাম সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য-২ অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তির নিবন্ধনে লিঙ্গ সমতা অর্জনকে স্বাগত জানায়। এটি লক্ষণীয় যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে দেশের এখনও অর্ধেক জনসংখ্যা দারিদ্র্যের নীচে বসবাস করছে।

৮৪) বুরুন্ডি নিম্নোক্ত অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানায়– ক) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন; খ) স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা ও বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং; গ) নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সরকারি উচ্চ পদে নিয়োগ দান। তারা বাংলাদেশকে শিশু শ্রম বন্ধের জন্য প্রশংসা করে।

৮৫) কম্বোডিয়া রোম স্টাটিউটসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশন অনুসমর্থন করার জন্য প্রশংসা করে। তারা দারিদ্র্য নির্মূল এবং গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্যও বাংলাদেশকে প্রশংসা করে।

৮৬) কানাডা ২০০৯ সনের অঙ্গীকার অনুসারে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং কতদূর অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চেয়েছে।

৮৭) চাঁদ সন্তুষ্টির সাথে উল্লেখ করে যে, বাংলাদেশ তার জাতীয় প্রতিবেদন ব্যাখ্যা প্রদানে সকল অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করেছে। তারা বলেন, মানবাধিকার উন্নয়ন এবং সুরক্ষায় যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করেছে সে বিষয়ে তারা অবগত আছেন।

৮৮) চিলি বাংলাদেশর কাছে জানতে চায় যে, ১৮ বছরের কম বয়সদের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড এবং যাবৎ জীবন কারাদণ্ড আরোপের জন্য কোন মান বিবেচনায় আনবে কিনা।

৮৯) চীন মানবাধিকার বিষয়ে বাংলাদেশের অর্জনকে প্রশংসা করে। তারা জোরালো ভাবে দারিদ্র্য হ্রাস নীতিমালা এবং নারী উন্নয়নের গুরুত্ব ও নারীর সহিংসতা রোধে গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরে । প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশ যে বাঁধার মুখোমুখি হয় চীন তা বুঝতে সক্ষম হয়।

৯০) কোস্টারিকা মানব পাচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। তারা নির্যাতনের ঘটনায় দায়মুক্তি প্রদানের অভিযোগগুলির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

৯১) আইভরি কোস্ট আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসমর্থন এবং নতুন মানবাধিকার আইন গ্রহণের বিষয় তুলে ধরে। তারা স্বাস্থ্য, চাকরি, বিচার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের উপর বৈষম্য বিষয়ে বাংলাদেশের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে।

৯২) কিউবা মানবাধিকার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের ব্যাপারে জোর দেয়। তারা দারিদ্র্য হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা, সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সবার জন্য শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম উপর ইতিবাচক ফলাফল তুলে ধরে।

৯৩) সাইপ্রাস নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধেপ্রচেষ্টা এবং শ্রমের বাজারে তাদের ভালো অবস্থানের কথা স্বীকার করে। দেশটি ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করার জন্য প্রশংসা করে।

৯৪) চেক প্রজাতন্ত্র মানবাধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ ও এগুলোর উপর বিস্তারিত প্রতিবেদনের জন্য প্রশংসা করে।

৯৫) ডেনমার্ক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অগ্রগতির জন্য প্রশংসা করে যদিও এর অনেক শর্ত এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তারা ১৯৯০ সাল থেকে লৈঙ্গিক সমতা নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরে ।

৯৬) জিবুতিমানবাধিকার কাউন্সিলকে শক্তিশালীকরণে বাংলাদেশের অসাধারণ অবদানকে অভিনন্দন জানায়। দেশটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভিশন প্রোগ্রাম ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সমর্থন করার আহ্বান জানায়।

৯৭) ইকুয়েডর বিগত ৪ বছরে সমাজের দরিদ্র এবং দুস্থ জনগোষ্ঠীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চায়।

৯৮) মিশর জানায় বাংলাদেশের আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপগুলি মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছে। দেশটি নারী ও শিশুদের অধিকার বৃদ্ধি, শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সহ দায়মুক্তি নির্মূল করে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার জন্য বাংলাদেশকে প্রশংসা করে।

৯৯) ফিনল্যান্ড নারী সহিংসতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায় কিন্তু নারীদের ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা প্রদানের বিদ্যমান সমস্যাগুলোতে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

১০০) ফ্রান্স প্রতিনিধি দলকে প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং রোম স্টাটিউট অনুসমর্থন করার জন্য স্বাগত জানায় ।

১০১) জার্মানী নারীর বিরূদ্ধে সহিংসতা এবং বৈষম্য প্রতিরোধ, পুলিশের দুর্ব্যবহার এবং দায়মুক্তির বিরূদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশকে স্বাগত জানালেও মাঠ পর্যায়ে সামান্য পরিবর্তন এসেছে বলে উল্লেখ করে।

১০২) গুয়েতামালা ভবঘুরে এবং গৃহহীনদের পুনর্বাসন, মানবপাচার প্রতিরোধ, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ এবং শিশুশ্রম বন্ধ নীতিমালা, শিশু অধিকার, নারী উন্নয়ন এবং গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশকে স্বাগত জানায় ।

১০৩) হোলি-সি মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টা তুলে ধরেছে এবং বিচার বিভাগ, পুলিশ, সামরিক এবং জেল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মাপকাঠির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলার জন্য বাংলাদেশকে উৎসাহ প্রদান করে।

১০৪) হাঙ্গেরী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে এখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় করার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করে। দেশটি জানায়, ধর্ম নিরপেক্ষতার বেলায় যেভাবে সাংবিধানিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল শিক্ষার অধিকারকেও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিলে ফলাফল আরো ভাল হতে পারে। দেশটি লৈঙ্গিক সমতা এবং নারী ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অসাধারণ অর্জনের বিষয় অবহিত হওয়ার কথা বলে।

১০৫) ভারত নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ, শিশুমৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ যা শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকায়নে অবদান রাখায় বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছে। দেশটি সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের বিরূদ্ধে বাংলাদেশের যুদ্ধ ঘোষণার প্রশংসা করে।

১০৬) ইন্দোনেশিয়া ২০০৯ সাল থেকে ব্যাপকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধনের জন্য বাংলাদেশকে প্রশংসা করে। দেশটি দুর্বলদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ন্যূনতম ছাড় না দেওয়ার নীতিমালা মেনে চলার জন্য বাংলাদেশকে স্বাগত জানায়।

১০৭) ইরান ইউপিআরের ১ম চক্রের পর থেকে মানবাধিকার রক্ষায় অগ্রগতি এবং শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ও স্বাস্থ্য সেবায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করে।

১০৮) ইরাক ইউপিআরের ১ম চক্রের পর থেকে সিআরপিডি-র প্রতি সাড়া দেয়া সহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার রক্ষায় প্রচেষ্টার জন্য বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানায়। দেশটি লৈঙ্গিক সমতা শক্তিশালীকরণে বাংলাদেশ কি পদক্ষেপ নিয়েছে সে ব্যাপারে জানতে চায়।

১০৯) আয়ারল্যান্ড রোম স্টাটিউট অনুমোদন করা সহ কারাবন্দীদের ভীড় নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য বাংলাদেশকে স্বাগত জানায়। দেশটি বাংলাদেশকে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার জন্য উৎসাহিত করে।

১১০) ইতালি আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, শিশুশ্রম, যৌন সহিংসতা ও শোষণ বাংলাদেশে এখনও ব্যাপক। দেশটি জাতীয় শিক্ষা নীতি এবং শিশু অধিকার আইনকে স্বাগত জানায়।

১১১) জাপান বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নকে প্রশংসা করে। দেশটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ছাড় না দেয়ার নীতিকে স্বাগত জানায়। ইহা চুক্তি সংগঠনগুলিতে যার মধ্যে রয়েছে Committee Against (CAT) and the committee on Economic, social land, cultural rights (CESCR) প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য ইহাকে উৎসাহিত করে।

১১২) জর্ডান মানবাধিকার উন্নয়ন ও রক্ষণে এবং মৌলিক স্বাধীনতা বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলির অনুসমর্থন, মানবাধিকার মাধ্যমে ইহার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, দুর্নীতিবিরোধী এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার জন্য বাংলাদেশকে প্রশংসা করে।

১১৩) কিরঘিজস্তান বিশেষভাবে মানব পাচার, চোরাচালান এবং এর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধ প্রতিরোধে আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক নীতি পদ্ধতি সংস্কারের বিষয় এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রক্ষণে আইন প্রণয়নের কথা তুলে ধরে।

১১৪) লাটভিয়া কয়েকটি Special mandate holder-কে বাংলাদেশ যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে তার জন্য প্রশংসা করে, কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুরোধ এখনও গ্রহণ করেনি বলে উল্লেখ করে। ইহা ICC Rome Statute-কে অনুসমর্থনের জন্য স্বাগত জানায়।

১১৫) লেবানন বাংলাদেশের নতুন আইনের মাধ্যমে মানবাধিকার নীতি ও প্রয়োগ শক্তিশালী করার চেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়। এবং UPR 1st Cycle সুপারিশমালা বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা সমর্থন করার বিষয় তুলে ধরে।

১১৬) লিবিয়া মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সহযোগিতা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের নীতিকে মূল্যদেয় যা তার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক Instruments এ অনুসমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করে। ইহা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, পেশাগত নিরাপত্তা, শিক্ষাগত বাজেট বৃদ্ধি এবং ২০১০ সালের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কৌশলকে স্বাগত জানায়।

১১৭) মালয়েশিয়া মানবাধিকার অবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার প্রতিশ্রুতিকে চলমান রাখা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীও শিশু অধিকার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশকে প্রশংসা করে।

১১৮) মালদ্বীপ বাংলাদেশের মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে আইন গ্রহণের জন্য স্বাগত জানায় এবং ইহার Special procedures and mandate holders-এর সাথে সহযোগিতার চেষ্টাকে প্রশংসা করে। কয়েকটা চ্যালেঞ্জ মুখোমুখি হওয়ার পরও সরকারের অর্জনকে মালদ্বীপ প্রশংসা করে এবং দেশে মানবাধিকার বৃদ্ধি করার জন্য ইহার অঙ্গীকারকে উৎসাহ প্রদান করে।

১১৯) মৌরতানিয়া উল্লেখ করে যে বাংলাদেশ মানবাধিকার উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণে গুরুত্ব প্রদান করেছে তা প্রশ্নোত্তর প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। ইহা অনেক

প্রক্রিয়া এবং তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ বিশেষত সংখ্যালঘু এবং শিশুশ্রম বিষয়ক আইন গ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে সম্মান প্রদান করে।

১২০) মেক্সিকো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতাকে স্বীকার করে এবং ইহাকে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাথে সহযোগিতা চলমান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ইহা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আর্থিক ও মানব সম্পদ উৎস বৃদ্ধি করার আহ্বান করে এবং সুপারিশ করে।

১২১) মন্ত্রী সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক সহিংসতায় পুলিশের লোকজন সহিংসতা দমনে সর্বাধিক সহিষ্ণুতা দেখানোর ফলে অনেক সংখ্যক পুলিশ আহত হয়েছে তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন পশ্চাদগামী শক্তিগুলিকে এ যাবত অর্জিত অগ্রগতিকে উল্টোদিকে ফেরানোর অনুমতি দেয়া হবে না। তিনি ১৯৭১ সালে গণহত্যা এবং মানবাধিকার বিরোধী অপরাধীদের চলমান বিচার প্রক্রিয়াকে সমর্থন দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর প্রশংসা করেন। তিনি অভিযুক্তদের iICT Act ১৯৭৩ অধীনে সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়া ও সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

১২২) মন্ত্রী বলেন যে, বাংলাদেশ পারিবারিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্যে এবং সকল ব্যক্তির মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে। মন্ত্রী জানান যে সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বর্ণ বিরোধী বৈষম্য আইন তৈরি হয়েছে যা সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচির আওতাভুক্ত।

১২৩) তিনি মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিক্ষা, খাদ্য, পুষ্টি, পানীয় জল, সেনিটেশন, চিকিৎসাসেবা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়ার বিষয় তুলে ধরেন। সরকার সাম্প্রতিককালে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যাপক নীতিমালা গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করেন।

১২৪) তিনি বলেন একই রিজার্ভেশন প্রত্যাহারের পর্যালোচনার সময় সরকার আর্টিকেল ২ নং এবং ১৬৯(সি)(১)সিডও'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতির ক্ষেত্রে উদ্যোগ করেছে।

তিনি বলেন সম্পত্তিলাভ, বা ভোগের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগতভাবে কিংবা যৌথভাবে, বিবাহকালীন সময়ে নারী ও পুরুষের কোন পার্থক্য নেই।

১২৫) মন্ত্রী বাংলাদেশ যে মানব পাচার বিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছে সে বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন, এ বিষয়ে যে জাতীয় কার্যনীতি ২০১২-২০১৪ আইন প্রণয়ন হয়েছে সে কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

১২৬) মন্ত্রী বলেন যে বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন ১৬৯ তার সংবিধানের বিধির আওতায় অনুসমর্থনের বিষয় বিবেচনা করছে। নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ পাস করা হয়েছে। তিনি বলেন, যে খসড়া সিএইচটি ল্যান্ড কমিশন (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন (সংশোধিত) আইন ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন, স্থিতাবস্থা এবং বিগত চার বছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং সেনিটেশন সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের আলোচনা করেন।

১২৭) মন্ত্রী বলেন যে OP-CAT অনুসমর্থন বিবেচনাধীন রয়েছে কিন্তু Treaty body-তে একটি মেয়াদ কালীন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারলে বাংলাদেশের পক্ষে তা বাধ্যবাধকতা পূরণের ক্ষমতা নির্ধারণ করা সম্ভব হতো।

১২৮) মন্ত্রী ইউপিআর প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা পুনঃদৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এনজিও, সিভিল সোসাইটি, প্রচার মাধ্যম এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সক্রিয়

অংশগ্রহণ, ট্রয়কা, সেক্রেটারি, দোভাষী এবং কাউন্সিল প্রেসিডেন্টকে সহযোগিতার জন্য তার প্রশংসা প্রকাশ করেন।

সারাংশ এবং সুপারিশ

১২৯। নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাংলাদেশ সরকারের সমর্থন লাভ করে: (শুধুমাত্র আদিবাসীদের অধিকার সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ সন্নিবেশিত হল)

১২৯.৪. যেসব আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে রাষ্ট্র ইতিমধ্যে একমত হয়েছে, সেগুলোকে (বিশেষ করে শিশু অধিকার সংশ্লিষ্ট) দেশীয় নীতি-কাঠামোকে সমন্বয় করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন (নিকারাগুয়া)

১২৯.৫. প্রধান আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোর বাধ্যবাধকতা সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে দেশটির আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের জন্য আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, বিশেষ করে নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ এবং প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের ক্ষেত্রে;

১২৯.৭. নারী অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলোর পর্যালোচনা অব্যাহত রাখুন এবং নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং গৃহায়ন সংক্রান্ত অধিকারগুলো উন্নয়নে সহায়তা করুন (কাতার)

১২৯.৮. বালিকা ও নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করুন, অপরাধীদের বিচার করুন এবং যৌন হয়রানি বিষয়ক আইন প্রণয়ন করুন (মালদোভা প্রজাতন্ত্র);

১২৯.৯. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও আইনি সহায়তা নিশ্চিত করুন (ফ্রান্স);

১২৯.১০. নারী ও বালিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সব ধরনের সহিংসতা আইনগত ভাবে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে যে দুর্বৃত্তরা বিচারের মুখোমুখি হয়েছে ও শাস্তি পেয়েছে এবং সহিংসতার শিকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তাৎক্ষণিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ এবং সামাজিক পুনঃএকীভূতকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন (উরুগুয়ে);

১২৯.১১.নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোকে আমলে নেয়ার জন্য ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্তকে সহায়তার জন্য আইনি সহায়তা, চিকিৎসাসেবা, পুনর্বাসন ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান অব্যাহত রাখুন (ইন্দোনেশিয়া);

১২৯.১২. মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সমন্বিত পাচারবিরোধী আইন 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২' এবং ২০১২-২০১৪ সময়কালে গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাসহ মানব পাচার, মানুষ চোরাচালান এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধ নির্মূল করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা অব্যাহত রাখুন (আজারবাইজান);

১২৯.১৩. মানব পাচার প্রতিরোধ ও নির্মূল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা জোরদার করুন (নাইজেরিয়া);

১২৯.১৪. নাগরিকদের অপহরণ, ব্যক্তি পর্যায়ে মানব পাচার, মানুষ চোরাচালান এবং এ ধরনের অপরাধ বন্ধ করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালান (শাদ);

১২৯.২৪. সামাজিক বৈষম্যের দিক থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা বিবেচনা করুন (ইকুয়েডর);

১২৯.২৬. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ এখতিয়ার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সহজপ্রাপ্য করুন (সাউথ আফ্রিকা);

১২৯.২৭. সংবিধান অনুসারে ন্যায়পাল (সরকারি ব্যক্তি বা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের পদাধিকারী) নিয়োগের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন (ইকুয়েডর);

১২৯.২৮. শিশু অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের সুপারিশ অনুযায়ী শিশু বিষয়ক ন্যায়পাল (সরকারি ব্যক্তি বা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অবিযোগ তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন (আলজেরিয়া);

১২৯.২৯. সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতির আওতায় গৃহীত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মানবাধিকার ইস্যুতে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখুন সোমালিয়া);

১২৯.৩০. মানবাধিকার প্রসার ও সুরক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন অব্যাহত রাখুন (জর্ডান);

১২৯.৩১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ বাস্তবায়ন এবং বাল্যবিবাহ মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন (সুইজারল্যান্ড);

১২৯.৩২. মানবাধিকার সুরক্ষা, সুশাসন ও আইনের শাসন বজায় রাখার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করুন (সুদান);

১২৯.৩৩. পুলিশ সংস্কার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতার নীতি বজার রাখার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করুন (ইন্দোনোশিয়া);

১২৯.৩৯. সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন এবং সে প্রচেষ্টাকে গতিশীল করুন (সিয়েরা লিয়ন);

১২৯.৪০. শিশু অধিকার উন্নয়নেন জন্য নীতিমালা গ্রহণ অব্যাহত রাখুন (জর্ডান);

১২৯.৪১. সরকারের চলমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচির মধ্যে নারী, শিশু ও জনগণের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান অব্যাহত রাখুন (কম্বোডিয়া);

১২৯.৪২. সংসদ সদস্য, বিচারকগণ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী (জনসেবক), আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের জন্য মানবাধিকার শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম জোরদার করুন (মরক্কো);

১২৯.৪৫. মানবাধিকার উন্নয়ন এবং সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতির ফলোআপে এনজিও, নাগরিক সংগঠনগুলো (সিএসও) এবং বেসরকারি খাতের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অব্যাহত রাখুন (জিবুতি);

১২৯.৪৭. দেশের মানবাধিকার সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে জাতিসংঘ মানবাধিকার ব্যবস্থার সাথে গঠনমূলক সহায়তা অব্যাহত রাখুন (উজবেকিস্তান);

১২৯.৪৮. যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল ও জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধিদের পরিদর্শন অনুমোদনসহ জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করুন (সিয়েরালিয়ন); চুক্তিভিত্তিক কমিটি এবং জাতিসংঘের বিশেষ প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বয় অব্যাহত রাখুন পেরু); জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের চুক্তিভিত্তিক কাঠামো ও বিশেষ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সাথে অধিকতর সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করুন (তুর্কমেনিস্তান);

১২৯.৪৯. চুক্তি কমিটিগুলোতে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান করুন (স্লোভেনিয়া-১); জাতিসংঘ মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিটিগুলোতে প্রতিবেদন প্রদানের প্রচেষ্টা জোরদার করার অব্যাহত রাখুন (ইউক্রেন-১); কিছু চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবেদন প্রদানের সামর্থ বৃদ্ধির কাজ আরো জোরদার করুন (জিম্বাবুয়ে)

১২৯.৫০. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করুন (পর্তুগাল); যথাসময়ে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো বরাবর প্রাথমিক ও নির্দিষ্ট মেয়াদকালীন প্রতিবেদন দাখিল করুন (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র);

১২৯.৫১. জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থা বিশেষ ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখুন এবং জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি বিবেচনা করুন (ফিলিস্তিন);

১২৯.৫৩. মানবাধিকার ক্ষেত্রে কৌশলগত সহায়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন (তুর্কমেনিস্তান);

১২৯.৫৪. মানবাধিকারের প্রসার ও সুরক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবাধিকার সংস্কৃতির অধিকতর উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন (সোমালিয়া);

১২৯.৫৫. মানবাধিকার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শক্তিশালী করার জন্য কাজ করুন (তুর্কমেনিস্তান);

১২৯.৫৬. দেশ জেন্ডার সমতা সম্প্রচারে অব্যাহতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করুন (গুয়াতেমালা);

১২৯.৫৭. দেশে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষ করে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তা শক্তিশালী করুন (আইভরি কোস্ট);

১২৯.৫৯. নারীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করুন (রাশিয়া);

১২৯.৬০. সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন (নেপাল);

১২৯.৬১. নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে প্রয়োজনীয় মনোযোগ প্রদান অব্যাহত রাখুন (সুদান);

১২৯.৬২. দেশের অভ্যান্তরে নারীদের প্রতি সব ধরনের বৈষম্যমূলক চর্চার বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে লড়াই চালিয়ে যান (আইভরি কোস্ট);

১২৯.৬৫. নারী ও শিশুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করুন (আফগানিস্তান);

১২৯.৬৬. নারীর ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে নারী অধিকার রক্ষার কাজ অব্যাহত রাখা (বলিভিয়া), নারীরক্ষমতায়ন বাস্তবায়নে আরও পদক্ষেপগ্রহণ করা (রুমানিয়া), নারী ও শিশুর ক্ষমতায়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান অব্যাহত থাকা (ফিলিস্তিন রাষ্ট্র)।

১২৯.৬৮. বিচার ও তদন্তপ্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান বিচার বহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড, নির্যাতন ও ববরতা, শাস্তি থেকে মুক্তিদান প্রভৃতি কার্যক্রমগুলোর সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা (নেদারল্যান্ডস)।

১২৯.৭৬. নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো তদন্ত করা এবং অপরাধীদের জবাবদিহিমূলক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

১২৯.৭৯. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করতে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত পুলিশ বা অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা (সাইপ্রাস)।

১২৯.৮০. মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্তকারীদের বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্বরতামূলক কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা (সুইজারল্যান্ড)।

১২৯.৮৩. বেসামরিক নাগরিকদেরপ্রতি সকল অত্যাচার ও হয়রানিমূলক ঘটনার জন্য দায়ী সকল কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া এবং দায়মুক্তির প্রচেষ্টায় সংগ্রাম করা (জার্মানি)।

১২৯.৮৪. বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনকারীদের বিচারের আওতায় আনার প্রচেষ্টা বাড়ানোর নিশ্চয়তা প্রদান করা (সুইডেন)।

১২৯.৮৭. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকারীদের জবাবদিহিমূলক ব্যাখ্যা গ্রহণে আরও শক্তিশালী কার্যক্রম হাতে নেয়া এবং নির্যাতিতরা যেসব বাধার সম্মুখীন হয় তা দূর করা (জাপান)।

১২৯.৯২. আইনের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর বিরূদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ করা এবং সঠিক তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি ও বিচার নিশ্চিত করা (অস্ট্রিয়া)।

১২৯.৯৩. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতার সকল মামলার কার্যকরী তদন্ত ও অনুমোদন নিশ্চিত করা (অস্ট্রিয়া)।

১২৯.৯৯. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক ও আইনি সুরক্ষা এবং বিশেষ করে সহিংসতার হামলার অন্তর্ভুক্ত উপাসনালয়গুলোর রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা (কানাডা)।

১২৯.১০০. ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা (জাপান)।

১২৯.১০৪. মানবাধিকারকর্মীদের রক্ষার প্রচেষ্টা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থানীয় ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে কোন ধরনের বাধা, হুমকি অথবা হয়রানি ছাড়া তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা (নরওয়ে)।

১২৯.১১৭ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপ যেমন নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করার জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা (ভিয়েতনাম)।

১২৯.১৪৪ আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষা আরও সুদৃঢ় করা এবং আইনের দৃষ্টিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা (থাইল্যান্ড)।

১২৯.১৫১ ধর্মীয় অধিকার ও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীদের অধিকার সুরক্ষার কাজ অব্যাহত রাখা (জিবুতি)।

১২৯.১৫২ দেশের ঝুকিপূর্ণ ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি রাষ্ট্রের সেবা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা (নিকারাগুয়া)।

১২৯.১৫৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণবাস্তবায়ন করা (অস্ট্রেলিয়া); পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রাখা (ইকুয়েডর)।

১৩০। নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তীতে সরকার সিদ্ধান্ত জানাবে (এখানে কেবলমাত্র আদিবাসী সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হল)

১৩০.৫ আদিবাসী ও ট্রাইবেল জাতিগোষ্ঠীর ১৯৮৯ সালের আইএল কনভেনশন নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করা (ডেনমার্ক)।

১৩০.১৬ আদিবাসী সমাজেরসাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার লক্ষ্যে আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ স্বাক্ষর করা (মেক্সিকো)।

১৩০.১৪ সিডও-তে নারীদের অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অপসারণসহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন জোরদার করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা (অস্ট্রেলিয়া)।

১৩০.১৫ দলিতদের পরিস্থিতি বিবেচনার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশনের সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ তাদের বৈষম্য দূর করা (স্লোভেনিয়া)।

১৩০.২২ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা অনুসারে সংখ্যালঘু আদিবাসীসহ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা (সুইজারল্যান্ড)।

১৩০.২৩ শিশু, নারী, দলিত, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, উদ্বাস্তু এবং অভিভাসীদের একটি বিশেষ অবস্থানে নিয়ে এসে উন্নয়নের চেষ্টা করা এবং তাদের সমস্যা দূর করা (ভ্যাটিকান সিটি)।

১৩০.২৪ সকল ধরনের সহিংসতা ও বৈষম্য হতে আদিবাসী শিশু ও নারীদের রক্ষায় সঠিক ও কার্যকরী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন ঘটানো (স্লোভাকিয়া)।

ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ ওয়ার্কিংগ্রুপ ১৬তম অধিবেশন
বাংলাদেশের ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ
অস্ট্রেলিয়ার বিবৃতি

অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানায়। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণবাস্তবায়নের সুপারিশ করছি।

বাংলাদেশে জীবনহানিসহ ধর্মীয় স্থাপনা ও জনগণের সম্পত্তিতে হামলার ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। একই সাথে দেশটির বিভিন্ন অংশে অনগ্রসর সংখ্যালঘুদের উপর চলমান সহিংসতা নিয়ে আমরা চিন্তিত। তবে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিবৃতিকে অস্ট্রেলিয়া স্বাগত জানায়। আমরা বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করছি যে তারা যেন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান মৃত্যুদণ্ডের বিধানের ব্যাপারেও আমরা সজাগ। এজন্য আমরা 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির' (ICCPR) দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রোটোকল বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দেশটিকে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার সুপারিশ করছি।

গত ইউপিআরের পর পরই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করায় অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে স্বাগত জানায়। অস্ট্রেলিয়া এ নীতিমালা বাস্তবায়নে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেয়া সহ CEDAW-র রিজার্ভেশনসমূহ তুলে নেয়ার সুপারিশ করছে।

ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ ওয়ার্কিংগ্রুপ ১৬তম অধিবেশনে ইন্টারেক্টিভ ডায়ালগ সেশনে বাংলাদেশ সম্পর্কে ডেনমার্কের বিবৃতি

উপস্থাপক: Ambassador Steffen Smidt

মি: প্রেসিডেন্ট ,

ডেনমার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা: দিপু মনি ও তার প্রতিনিধিদলকে তাদের উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানায়।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের অগ্রগতিকে ডেনমার্ক প্রশংসা করে। তবে চুক্তির অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনও অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। সমতলের আদিবাসীরাও অনেক ক্ষেত্রে এখনো বঞ্চিত।

ডেনমার্ক বাংলাদেশ সরকারকে আইএলও কনভেনশন ১৬৯ বাস্তবায়নের সুপারিশ করছে যেটির লক্ষ্য হচ্ছে আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি রক্ষাসহ তাদেরকে নিজেদের উন্নয়ন নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম করে তোলা।

আমরা সরকারকে পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণবাস্তবায়ন ও এ লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়নসহ সময়সীমা নির্ধারণ করার অনুরোধ করছি। এছাড়া অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধনেরও অনুরোধ জানাচ্ছি।

নব্বইয়ের দশক থেকে আজ পর্যন্ত লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখজনক সাফল্যকে ডেনমার্ক অভিনন্দন জানায়। তবে নারী নির্যাতন বন্ধে অনেক আইন থাকলেও তা বাস্তবায়নের গতি খুবই শ্লথ।

ডেনমার্ক বাংলাদেশ সরকারকে CEDAW-র রিজার্ভেশনসমূহ তুলে নিয়ে পারিবারিক নির্যাতন আইন বাস্তবায়নের সুপারিশ করছে।

ধন্যবাদ।